মুক্তধারা

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পোদ্দার

১৩২১

মাতার চরণে

ভূমিকা

গত বৎসর এমনই শুভদিনে যখন প্রকৃতিরাণী জগজ্জননীর আগমন-প্রতীক্ষায় উৎফুল্ল হইয়া শারদ-শ্রীতে পরিপূর্ণা—ধরিত্রী যখন মাতৃত্ব-বিকাশের পূর্ণতা লাভ করিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী,—যখন কমকণ্ঠ বিহগ-কূজনে ও কাননজয়ী কুসুম-সৌরভে মার শুভাগমন-বারতা জানিতে পারা যাইতেছিল—কবির ভাষায় বলিতে গেলে যখন 'চখার কণ্ঠে মার আগমনের সাড়া পাওয়া যাইতেছিল'—যখন 'শিশির-আর্দ্র বাতাসের মুখে' মার বোধন-গীতি অনুরণিত হইতেছিল—যখন 'রোদে আর মেঘে নদীসৈকতে খেলা করিতেছিল'—যখন 'সন্ধ্যা-রঙ্গীণ শিউলির আড়ে' ও 'দোপাটির ফাঁকে ফাঁকে মার সাড়ীর প্রান্ত দেখা যাইতেছিল'—তখন আমার পরম স্নেহাস্পদ অনুজ-প্রতিম শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ভায়া 'মুক্তধারার' নবীন লেখক কুমিল্লাবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র পোদ্দার মহাশয়কে আমার নিকটে পাণ্ডুলিপি সহ লইয়া আসেন ও উহা সংশোধন করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন লেখক মহাশয় স্মৃতির শ্মশানে বসিয়া সাধনা করিতেছেন—একটুখানি সহানুভূতি পাইবার জন্য শোকার্ত্ত হৃদয়ে একটু শান্তি পাইবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার নয়নধারা মুক্তধারার ন্যায় অজস্র বিগলিত।

পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকজন লেখকের ন্যায় তাঁহারও মনের কতকটা ধারণা ছিল—কিপ্‌লিংএর ভাষায় বলিতে গেলে—"পূর্ব্ব পূর্ব্বই, পশ্চিম পশ্চিমই, উভয়ের মিলন অসম্ভব।" তবু তিনি আসিয়াছিলেন, সেটা বোধ হয় স্থান-মাহাত্ম্যে। আর স্থান ও কাল ভিন্ন জগতে শোকের উপশম কে করিতে

পারে? কালে শোকের বেগ প্রশমিত হয়—কালে ক্ষত শুকাইয়া যায়—কালে নূতন আসিয়া পুরাতনের স্থান পূরণ করিয়া দেয়।

যখন কার্ত্তিকবাবু তাঁহার অন্তর্জ্বালা দূর করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া সুদূর যমুনা-পুলিনে রাসেশ্বর ব্রজবিহারীর প্রেমমাখা চিরপরিচিত পথে পথে ঘুরিয়াও শান্তি পাইলেন না—যখন তাঁহার এক একবার মনে হইতেছিল—"আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিব, আবার নূতন অভিনয়ে যোগ দিব, আবার নূতন খেলা খেলিব"—আবার পরমুহূর্ত্তেই যখন তিনি ভাবিতেছিলেন—"স্মৃতিই যদি চলিয়া যায়, তবে থাকিব কি লইয়া? জীবন ধারণ করিব কাহাকে আশ্রয় করিয়া? পথ চলিব কি সম্বল লইয়া? সাধনা করিব কাহার? ঐ স্মৃতিটুকু ছাড়া যে আমার আর কোন সম্বল নাই?"—যখন এরূপ সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান, তখন তাঁহার হৃদয়ের যাতনা মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া ভাষার কম-আবরণে আবৃত হইয়া দেখা দিল। তাঁহার প্রাণের অরুন্তুদ যাতনা মুক্তধারার মত বাহির হইল।

বর্ত্তমান কাব্যের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট তিনি যে সহানুভূতি কেন পাইবেন না তাহার একটু কৈফিয়ৎ দিবার জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিলাম,—মহাশয়, পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ বঙ্গ জানি না—জানি শুধু অখণ্ড বঙ্গ। ধনধান্যপূর্ণা শস্যশ্যামলা বঙ্গ-জননীর উৎসঙ্গে যাহারা লালিত—বাঙ্গালার মাটীতে, বাঙ্গালার জলে,—বাঙ্গালার হাওয়ায় যাহারা পুষ্ট হইয়াছে—তাহারাই আমাদের সোদর—জাতি-নির্ব্বিশেষে, স্থান-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালার অধিবাসী মাত্রেই আমাদের আপনার জন—তখন তিনি কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। আরও যখন তাঁহাকে বলিলাম, চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে আমিও তাঁহারই মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম—যখন আমিও তাঁহারই মত একজন ভুক্তভোগী, তখন আমার নিকট হইতে

সহানুভূতি ত পাইবেনই। অন্যের নিকট ইহা সুদুর্ল্লভ হইতে পারে—কাম্য হইতে পারে—কিন্তু আমার কাছে ইহা অনায়াস-লভ্য। আর আমাদের ন্যায় দন্তহীনের নিকট দন্তের মর্য্যাদা খুব বেশী।

যাক্ সে কথা। পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া কার্য্য-সৌন্দর্য্যে, ভাবসম্পদে, লিখনচাতুর্য্যে ও সন্নীতিমূলক আদর্শের পরিকল্পনায় কার্ত্তিক বাবুর কৃতিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম; সত্যকথা বলিতে কি এশ্রেণীর যতগুলি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, বা মাসিক পত্রে প্রকাশিত যতগুলি অনুভূতি-মূলক প্রবন্ধ দেখিবার সুবিধা পাইয়াছি, তাহার মধ্যে অনেকগুলি প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য চন্দ্রশেখরের অমরকাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র অন্ধ অনুকৃতি; কিন্তু এখানি ঠিক তাহা নহে; পাঠক মহাশয়েরা পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন; তবে একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে, লেখক মহাশয় চন্দ্রশেখর বাবুর চরণ শরণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত মার্গে কতকটা চলিয়াছেন; উভয়ের মধ্যে ভাবের বেশ একটু পার্থক্যও লক্ষিত হয়। 'এই মুখখানি' ও 'শ্মশান' প্রবন্ধে আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য আপনারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মুক্তধারার প্রেম অন্তর্মুখী—এ প্রেমের লক্ষ্য শ্রীভগবান্। নদনদী সমূহ যেরূপ আপনার গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া, সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নয়নাভিরাম সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়, আলোচ্য কাব্যের প্রেমও সেইরূপ সকল পথ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রেমের সহিত মিলিত হইবার জন্য উন্মত্তভাবে ছুটিয়াছে।

আলোচ্য কাব্যখানি অনুভূতির সামগ্রী। হৃদয়ের ভাবের সাহায্যে ইহা পাঠ করিতে হইবে। ভাব-প্রবণ না হইলে ইহার সম্যক্ রসগ্রহণ করা যাইবে না। লেখক মহাশয়ের ভাবে উচ্ছ্বাস আছে—আবিলতা নাই। প্রেম আছে—লালসা নাই; এ প্রেমে কামগন্ধ নাই। এ প্রেম "স্বচ্ছ—দর্পণের মত স্বচ্ছ—স্ফটিকের মত স্বচ্ছ—শারদ বাসন্তী পৌর্ণমাসী

রজনীর মত স্বচ্ছ।” আবার এই প্রেম-প্রবাহের মুখের প্রতিবন্ধকটা একটু খানি সরাইয়া দিলে প্রেম-সাগর শ্রীকৃষ্ণের চরণে গিয়া পতিত হইবে। লেখক মহাশয়ের প্রেমের আদর্শ ‘অর্দ্ধনারীশ্বর’মূর্ত্তি—কবির ভাষার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলি—

‘যার প্রাণ এত শাদা
যে দেয় জায়ারে আধা’—

এ যে সেই দেবতার মূর্ত্তি—পুরুষ কর্ত্তৃক রমণী-দলন এখানে নাই—আবার য়ুরোপের সাফ্রিজিষ্ট রণচণ্ডীদের মত স্বাধীনতা-প্রয়াসী নারীমূর্ত্তির প্রাধান্যও নাই—এ যে পুরুষ ও প্রকৃতির—জ্ঞান ও ভক্তির—বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব মহামিলন। লেখক মহাশয়ের ভাষায় বলি,—“অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি—অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, জীবকে যেন স্পষ্ট করিয়া বলিতেছে তুমি ও আমি এক হইব। আমি তোমাতে ডুবিয়া থাকিব, তুমি আমাতে ডুবিয়া থাকিবে। এই ত প্রেমের শেষ, এই ত প্রেমের মহামিলন। অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তি সেই প্রেমের অভিজ্ঞান। তাই মনে হয়—উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধুইয়া মুছিয়া এক হইতে পারিল না। অর্দ্ধেক পুরুষ অর্দ্ধেক রমণী রহিল। আমি তোমায় ভালবাসি বলিয়া—নির্নিমেষ নয়নে অহরহঃ তোমায় দেখিতে চাহি বলিয়া—তোমার অর্দ্ধেক আমাতে সংলগ্ন রহিল; আবার তুমি আমায় ভালবাস বলিয়া মীনের ন্যায় পলকহীন নয়নে আমায় দেখিতে চাহ বলিয়া—আমার অর্দ্ধেক তোমাতে সংলগ্ন রহিল। ভালবাসার আদান প্রদানে এই যে আপোষ, একীকরণের এই যে সামঞ্জস্য, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর—ইহাই হরগৌরীর মহামিলন—অদৃষ্ট প্রেম-মূর্ত্তির অপূর্ব্ব উজ্জ্বল প্রতিমা!”

এচিত্র অঙ্কিত করিয়া লেখক মহাশয় যে আদর্শ বাঙ্গালীর নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব নহে সত্য—ইহা হিন্দুর

প্রেমের সনাতন আদর্শ; কিন্তু এই আদর্শ হইতে আমরা কতদূর সরিয়া আসিয়াছি—তাহা একবার বাঙ্গালার অধিকাংশ গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা যেন আবার এই আদর্শ-প্রেম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ করে। বাঙ্গালার স্বামী-স্ত্রী মনের সুখে দুয়ে মিলিয়া এক হইয়া আবার কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়।

“মুক্তধারার” সুচিন্তিত চিন্তারাশি সুগ্রথিত। স্তর-বিন্যাসগুলিও আমার নিকট খুব স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত ভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইল। ‘এই মুখখানি’ দেখিয়াই মনে ‘পার্থিব-প্রেমের’ অভ্যুদয় হয়। তাহার অন্তর্দ্ধানে অতীত সুখের স্মৃতির কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে সুন্দরতম ‘ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে’র কথা মনে পড়িয়া যায়—আর তখন স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অনবদ্য সুন্দর ‘কে সে?’ যাহার অভাবে সকলই অন্ধকার দেখিতে হয়। ‘কি রূপ’ তাঁহার, যাহার জন্য পতঙ্গের ন্যায় অনলে ঝাঁপ দিতে হয়। আর রূপকে চিনিতে পারিলে অরূপকেও চিনিতে পারা যায়—তখন বোধ হয় ‘বচনাতীত নিত্য শান্তিপূর্ণ, মধুর অমিয় মাখান রূপে যেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া রহিয়াছে।’ মানব যখন রূপ দেখিয়া কুল হারাইতে বসে, তখন অহমাত্মিকা বুদ্ধি এই ‘আমি’টা যে কে তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে। তার পর যখন নির্ব্বিকার ক্ষেত্র, তত্ত্ব দীক্ষা-দায়ী স্থান শ্মশানের চিতা-ধূমে আপনার জনে বিসর্জ্জন দেয়, তখন শান্তির অভিলাষী হইয়া ‘যমুনা-পুলিনে’ ছুটাছুটী করাই তাহার পক্ষে স্বভাবিক।

আমি পুস্তক খানির সমালোচনা করিতে বসি নাই—ইহা আমার ভাল লাগিয়াছে বলিয়া সাধারণে প্রকাশ করিবার জন্য লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার সে অনুরোধ আজ রক্ষিত হইয়াছে।

সন্তপ্ত-হৃদয় নবীনলেখক বিষাদের ভিতর দিয়া যে ভাবের অভিব্যঞ্জনা আনিয়াছেন—যে সকল দার্শনিক মতামতের আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি, চিন্তাশীলতা, অনুশীলনতৎপরতা ও কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। মাতৃ-মন্দিরের পূজার দ্বারে যে নবীন-লেখক অর্ঘ্য লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান তাঁহার আশা ফলবতী হউক—ইহাই আমার প্রাণের ঐকান্তিক কামনা। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি—

শনিবার, মহালয়া;
২রা আশ্বিন, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সূচীপত্র।

নিবেদন

বিশাল বিরাট বিশ্বের চারিদিকে চাহিয়া দেখি—সকলেই কিছু না কিছু করিতেছে। কেহ ধনের আশায়—কেহ মানের আশায়—কেহ সুখের আশায় অহর্নিশ আশামরীচিকায় ছুটিতেছে। কেহই বসিয়া নাই—বসিয়া থাকিতে পারে না। কে যেন প্রতিনিয়ত মানুষকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, আর মানুষ অবাধে—নীরবে চলিতেছে। কেহ সৎপথে ধাবিত হইতেছে, কেহ অসৎপথে চালিত হইতেছে; কেহ পুণ্য-পবিত্রতার জন্য—জ্ঞানধর্ম্মের জন্য একাগ্র সাধনায় নিরত; আর কেহ বা নরকের পথে সানন্দে প্রধাবিত; তাহার সেই উদ্দাম গতিতে পথের ধূলি উড়িয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া দিতেছে; তাহার নারকীয় চীৎকারে কর্ণ বধির করিতেছে; তাহার অন্তর্নিহিত পাপতমসায় গগন-পবন আবরিত হইয়া যাইতেছে।

চারিদিকে যখন এই অভিনয় চলিতেছে, তখন আমি—এই ক্ষুদ্র মানবসন্তান আমি—পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র প্রান্তে—এক অন্ধকারময় কোণে বসিয়া কি করিতেছি? কি করিতেছি—এ প্রশ্নের উত্তর কেমন করিয়া দিব? আমি যে নিজেই ভাবিয়া দিশেহারা হইয়া যাই, আমি কি করিতেছি!

"আমি কি করিতেছি," তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না! এক একবার খুব মনঃসংযোগ করিয়া তাহাই ভাবি, অমনি—

"ভাব্‌তে গেলে মাথা ঘোরে
ভাবনা শেষে ভাব না পায়।"

আমারও তাই হইয়াছে। আমি ভাবিতে বসিলে কত ভাবনা—কত দিক্‌ হইতে আসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরে, তখন আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়, আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা সংগ্রাম বাধিয়া যায়। তাহার মধ্যে কে আগে আমার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিবে, কে আগে তাহার আসন প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাই লইয়া ঘোর কোলাহল উপস্থিত হয়। আমি তখন সকল ভাবনার মূল হারাইয়া—তাহাদের ভাব না পাইয়া অধীর হইয়া পড়ি। তখন আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠে—দাবাগ্নির মত আগুণ জ্বলিয়া উঠে, আমার চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাই—ধূ ধূ করিয়া শ্মশানচিতা জ্বলিতেছে। যে চিতা একদিন নিজ হস্তে সাজাইয়াছিলাম, যে চিতায় একদিন আমার জীবনের সর্ব্বস্ব, আমার সংসার-শ্রী—স্বর্গসম্পদ, আমার আঁধার ঘরের রত্নপ্রদীপ, আমার ইহকাল ও পরকাল তুলিয়া দিয়াছিলাম; সেই চিতার আগুণ তখন প্রচণ্ডবেগে সহস্র জিহ্বা বাহির করিয়া আমাকেই পোড়াইতে আইসে। আর আমি তখন সেই তাপদগ্ধহৃদয় লইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকি—আর আমার ভাবনা-চিন্তা সব সেই আগুণের মধ্যে পড়িয়া কাতরোক্তি করিতে থাকে! হতাশ-হৃদয়ে, বেদনা-প্রপীড়িত যন্ত্রণাময় প্রাণে চাহিয়া দেখি—আমার জীবনসঙ্গিনী আলোক-রথে চড়িয়া দ্যুলোকপথে কোথায় চলিয়া যাইতেছে; তখন

প্রাণের মধ্যে কি যে করিয়া উঠে, হৃদয়ের পরতে পরতে কি যে জ্যোতিঃ আসিয়া পলকে হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া যায়, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব—কোন্ ভাষায় ফুটাইব?

বলিতে পার কি?—এই অসীম অনন্ত বিশ্বে আমার জন্য আর কত দুঃখ, কত জ্বালা, কত যন্ত্রণা সঞ্চিত আছে? আমি আর এমন করিয়া কতদিন জ্বলিতে পুড়িতে থাকিব? এমন করিয়া কতদিন তিলে তিলে—পলে পলে মরিব? মরণ ত চাই, কিন্তু ছাই মরণ যে হয় না! মরণ যে আমাকে দেখিয়া দূরে পলায়ন করে। শুধু এক একবার দেখা দিয়া, সে দূরতর—দূরতম দেশে চলিয়া যায়! তখন আমি আমার এই—ছায়া-জল-তৃণদল-হীন জীবন-প্রান্তরে পড়িয়া হাহাকার করি—শুষ্ক ক্রন্দনে তাহার কোমলতাহীন বক্ষকে আরও উত্তপ্ত করিয়া ফেলি। এমন করিয়া কত দিন যাইবে?—আমি যে আর পারি না!

এক একবার মনে হয়, যিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, বিধানকর্ত্তা, তাঁহার দেখা পাইলে বলিব,—"প্রভো! আমার আর কোন প্রার্থনা নাই—আমি আর কিছুই চাহি না। শুধু আমার এই স্মৃতিটাকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে চাই। আমি আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিব, আবার নূতন অভিনয়ে যোগ দিব, আবার নূতন খেলা খেলিব।"

আবার আমার এও মনে হয়—স্মৃতিই যদি চলিয়া যায়, তবে থাকিব কি লইয়া? জীবনধারণ করিব কাহাকে আশ্রয়

করিয়া? পথ চলিব কি সম্বল লইয়া? সাধনা করিব—কাহার? ঐ স্মৃতিটুকু ছাড়া যে আমার আর কোন সম্বল নাই। ঐ যে আমার এই কঠোর কণ্টকপূর্ণ জীবন-পথের একমাত্র পাথেয়। আমি যে দিনরাত্রি উঁহাই লইয়া—উহারই মোহে ভুলিয়া থাকি। হউক উহা যন্ত্রণাময়—হউক উহা হৃদয়ভেদী—হউক উহার দংশন জ্বালাময়—তবুও আমি উহাকে ছাড়িতে পারিব না। উহাকে ছাড়িয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব—একান্ত অসম্ভব। আমি উহা ছাড়িব না—আমি চিরজীবন দুঃখকষ্টের পসরা মাথায় করিয়া এই ভবের হাটে ফিরিব—উহারই বেচাকেনা—বিনিময় করিব। আমার জন্য ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে ইহারই মধ্যে একটা কথা একবার বলিতে ইচ্ছা করে; কথাটা সাধক রামপ্রসাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল—

"প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি! বোঝা নামাও একটু জিরাই;
সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুঃখের বড়াই॥"

আমিও বলি, আমি দুঃখ-শোক-যন্ত্রণার বড়াই করিব। কিন্তু মা ব্রহ্মময়ি! বোঝাটা মধ্যে মধ্যে এক একবার নামাইও। আমি একটু হাঁফ ছাড়িয়া লইব—একটু জিরাইয়া লইব; নহিলে ঐ স্মৃতির—ঐ দুঃখযন্ত্রণার বোঝা মাথায় লইয়া চলিতে চলিতে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িব, বড়ই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িব।

কত কি বলিতেছি, যাহা বলিবার নয়, তাহাও বলিয়া

ফেলিতেছি,—যাহা চাহিবার নহে, তাহাও চাহিয়া বসিতেছি—যাহা পাইবার নহে, তাহাও পাইবার আশা করিতেছি।

এবার যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা ত করিতেছি, কিন্তু আবার যখন আসিতে হইবে, তখনও কি ইহাই করিব? তখনও কি এমনি করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া—এমনি করিয়া দুঃখ-শোক-গ্লানির অন্তর্জ্বালাময় পসরা মাথায় করিয়া দেশে দেশে—গ্রামে গ্রামে—ঘরে ঘরে ফিরিব? সেই কথাটা কি কেহ আমাকে একবার বলিয়া দিতে পার? ভবিষ্যতের যবনিকা অপসারিত করিয়া সেই দৃশ্যটী কি একবারের জন্য—এক নিমেষের জন্য আমাকে কেহ দেখাইতে পার? সেইটী দেখিবার জন্য এক একবার মনে বড় বাসনা হয়; তাহা মুখ ফুটিয়া বলিব কি? কেহ শুনিবে কি? আবার যদি আসি—আবার যদি এই দুর্লভ মানব-জন্ম পাই, তাহা হইলে যাহাদিগকে অনাদরে—উপেক্ষায় বিদায় দিয়াছি, কি একটা মোহে বিহ্বল হইয়া যাহাদিগের দিকে চাহিয়া দেখি নাই, যাহাদের আদর করি নাই, যাহাদের স্নেহ-ভালবাসা—আত্মত্যাগের মর্ম্ম বুঝি নাই, আবার যদি আসি—তখন কি তাহাদিগকে পাইব?—যেমন গিয়াছে, তেমনই ভাবে পাইব? এ কথাটার উত্তর কি কেহ দিতে পারিবে না?

বড় কষ্টে—বড় যন্ত্রণায়—এ কথাগুলি বলিতেছি। কিন্তু বড় দুঃখ যে, কেহ আমার এই অন্তর্জ্বালা বুঝিল না!

যাহারা বুঝিত; যাহারা আমার জন্য কাঁদিত, তাহারা ত নাই। তাহারা যে আমার জন্য প্রাণপাত করিয়াছে! তবে কে বুঝিবে?

আর কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক, তুমি একবার বুঝ—দয়ার নিধি, কাঙ্গালের ঠাকুর! তুমি একবার বুঝিয়া দেখ! ওগো, তুমি একবার বুঝিয়া দেখ! তোমার কাছে আর কি চাহিব? তোমার কাছে চাহি—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছা'য়ে,
তব পুণ্য-কিরণে দিয়ে যাক্ মোর মোহ-কালিমা ঘুচা'য়ে!"

৯নং শোভারাম বসাকের ষ্ট্রীট,
বড়বাজার, কলিকাতা।

গ্রন্থকার।

মুক্তধারা

এই মুখখানি

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের গ্রন্থকার তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ "সেই মুখ-খানি"তে বিশেষ একটী ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রথম যৌবনোদ্যমে যখন তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করি, তখন তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত "সেই মুখখানি"তে বাস্তবিকই আমি আত্মপ্রাণ দান করিয়াছিলাম। তাহা না হইলে কেন সে সুরার মাদকতা এখনও আমাকে আলোড়িত করিয়া তুলে? থাকি—থাকি—মনে হয়—"সেই মুখখানি"! "সেই মুখখানি" যেন কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে! তবু তাহাকে চাই, অথচ যেন পাইতেছি না, হাত বাড়াইতেছি—হাতে লাগিতেছে না; খুঁজিতেছি—খুঁজিয়া যখন পাইতেছি না, তখনই মনে পড়িতেছে "সেই মুখখানি"! "সেই মুখখানি" দেখিবার আমার বড় সাধ, তাহার জন্য পাগল হইয়াছি। সে যে দেখা জিনিস, তাহাকে লইয়া অনেকবার নাড়াঘাটা করিয়াছি,

তাই তাহাকে বড় ভালবাসি। সেই ভালবাসায় পড়িয়াই ত চাই—"সেই মুখখানি"।

গ্রন্থকার "সেই মুখখানি"তে যে সুর ঢালিয়া দিয়াছেন, সেই সুর এখনও আমার ভাঙ্গাচোরা হৃদয়কুটীরখানিকে মাতাইয়া রাখিয়াছে। সে সুর যেন ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, পঞ্চম প্রভৃতি স্বরসপ্তকের আত্মা লইয়া গঠিত। তাহার মোহন নবমূর্ত্তি নিত্য-সুন্দর ও মনোহর। তাহার স্বভাবজ কোমলস্বর স্মৃতিহর ও নিত্য শ্রুতিসুখকর। সে যেন আর পুরাতন হইতে চাহে না। ইহাতে গৌরব কাহার?—"সেই মুখখানি" যাহার—না গ্রন্থকার কবির? আমি ত বলি, ইহাতে গ্রন্থকার কবিরই গৌরব সমধিক। কেন না, "সেই মুখখানি" ত অনেকেই দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন, কিন্তু কে এমন অমৃতভরা, আকুলতামাখা সরস শব্দগুলি—শব্দসাগরের নিখুঁত রত্নগুলি একত্র সংযোজন করিয়া একটী মনোহরণ চিত্র প্রস্তুত করিতে পারেন? যেমন তেমন চিত্র নহে, ইহার একটা নবাবিষ্কৃত সঞ্জিবনী শক্তি আছে। সে আবার অতীত কাহিনীকে বেশ স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। প্রাণের আবর্জ্জনাকে দূরে টানিয়া ফেলিয়া দিবারও ক্ষমতা ধারণ করে। তাই বলিতেছিলাম, "সেই মুখখানি" যাহার, তাহার অপেক্ষা যিনি "সেই মুখখানির" চিত্রকর, তিনিই ধন্যবাদের পাত্র—প্রণম্য, আরাধ্য, শ্রদ্ধাস্পদ ও পরম পূজনীয়।

আবার অনেকে হয় ত বলিবেন, "সেই মুখখানি"ত কল্পনার

নহে, কবি ত কোন সৌন্দর্য্য-সুষমার অজ্ঞাত সুরম্য স্বর্গরাজ্যে বা প্রকৃতির জন-দুর্লভ-আনন্দ-মুখর বিহঙ্গ-কলায়িত শান্তিময় প্রমোদারণ্যে যাইয়া তাহা সংগ্রহ করেন নাই, যাহা "সেই মুখখানি"তে নিত্য বিরাজিত, নিত্য বিভাসিত, নিত্য মণ্ডিত, নিত্য জাগ্রত—তাহারই কণিকা লইয়া, কবি ভাবে বিভোর হইয়া আমাদের সম্মুখে—আমাদেরই পরিচিত নিত্য-সুলভ সেই ভাব-মহার্ঘ্য বস্তুকে ধরিয়াছেন। আমাদের চেনামুখ চেনাইয়াছেন। বরং আমরা কবির মুখে তাহার নাম-গান শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িয়াছি। যখনই তাঁহার মুখে আমাদের প্রাণের গান শুনিয়াছি, তখনই আমাদের প্রাণের দৃষ্টি সোৎসাহে সেই দিকে পড়িয়াছে, ক্ষুধিত-লক্ষ্য সেই দিকে প্রধাবিত হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, বিস্মৃতি চলিয়া গিয়াছে। যাহা চাই, তাহা সম্পূর্ণ না পাইয়া কতকটা পাইলেও আমরা আত্মতৃপ্তি অনুভব করি এবং যিনি তাহা প্রদান করেন, তিনিও আমাদের প্রিয়সামগ্রী হইয়া থাকেন। সেই হিসাবে কবি আমাদের সম্মানার্হ, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া, "সেই মুখখানি"র শ্রেষ্ঠত্ব কবির প্রতি সংন্যস্ত করিব না। সে যে আপন ভাবের গরবিনী। কেমন,—কথা এই ত?

"সেই মুখখানি"!—কেন বল দেখি—তাহার কথা উঠিলেই প্রাণের মধ্যে একটা হাঙ্গামা পড়িয়া যায়, একটা আন্দোলন ব্যাপার ঘটে, একটা উল্লাসের তাড়া আসিয়া খেলা করে,

একটা বিজলী চমকিয়া যায়, একটা তথ্য আসিয়া পৌঁছুছায়? এমনটী ত আর কোনটীতে দেখি না! আর দেখিতে পাইব কি না, তাহাও জানি না। কিন্তু "সেই মুখখানি" কি? তাহাতে কি আছে? সে ত ভূত-সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। পঞ্চভূতে তাহার গঠন হইয়াছে, পঞ্চভূতে তাহার সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে, পঞ্চভূতেই তাহাতে অমরাবতীর সৌন্দর্য্য ঢালিয়াছে, পঞ্চভূতেই তাহাকে পাঁচের কাছে বাহবা পাওয়াইয়াছে। রোমান্টিক্ ভালবাসা—যাই বল, সকলই তাহাতে পঞ্চভূত-প্রদত্ত। যত কিছু প্রাণ ভরিয়া ভাব, যত কিছু চক্ষু ভরিয়া দেখ, যত কিছু ন্যায়, বিজ্ঞান, দর্শন, বেদবেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ হাল্‌টাইয়া উলোট্ পালট্ কর, দেখিবে—সবই পঞ্চভূতের বিকার। আর আমরা তাহারই জন্য আকাঙ্ক্ষিত, লালায়িত ও পিপাসিত। নূতন যেন আমাদের প্রাণের প্রিয় শান্তি। একটা নূতন কিছু দেখিলেই, প্রাণ কাহারও অপেক্ষা করিবে না—তাহারই পানে ছুটিবে, কোন বিঘ্নবিপত্তি মানিবে না। নিত্য আমরা যাহা দেখিতেছি, নিত্য যাহা লইয়া আমরা উপভোগ করিতেছি, নিত্য যাহা না জানিয়া করিতেছি, তাহাই রকমারি করিয়া আমাদের সম্মুখে আনয়ন কর, আমরা তাহাতেই বিমোহিত হইব, তাহাতেই আকৃষ্ট হইব—ইহা যেন মানবের নিত্য প্রকৃতি। কেন এমন হয়? ইহা কি মানবের অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তির ফল? না এই প্রকৃতি লইয়া আদি মানব এই জড় জগতে জন্মলাভ করিয়াছে?

কিন্তু “সেই মুখখানি”—কিছুতেই তাহা ভোলা যায় না। তাহা পঞ্চভূতবিনির্ম্মিতই বল, তুলিকার চিত্রই বল, নিপুণ কারিকরের কারুযন্ত্রের অপূর্ব্ব শিল্প-পরাকাষ্ঠাই বল, স্নেহ—সোহাগ—দয়া—মায়া—বাৎসল্য—মমতা—দাক্ষিণ্য প্রভৃতির সমষ্টিভূত একটা অলৌকিক অনন্যসাধারণ অনায়াসদুর্লভ অনিন্দ্যসুন্দর অমিয়মাখা সৌন্দর্য্যের কথাই বল—যাহা বলিবে, তাহাই সাজিবে, তাহাই মানাইবে, তাহাই হইবে। তবে হইবে না—মাত্র রুচিবিরুদ্ধ, হইবে না—মাত্র লোচন বিঘ্নদায়ক, হইবে না—মাত্র কুৎসিত। সৌন্দর্য্যের—সুষমার সে আদর্শ নির্ম্মল প্রতিমা, মহাশৈলের সে উচ্চচূড়া, মরুভূমির সে ওয়েসিস, তৃষ্ণার্ত্তের সে স্বচ্ছ নির্ম্মল শীতল সরোবর, শ্রান্ত পথিকের সে বসন্ত-বায়ু-আন্দোলিত বটবিটপী-স্নিগ্ধচ্ছায়া। বিলেতি হিসাবে উদাহরণ দিতে হইলে—সে ফুটন্ত গোলাপ, হিমানী-নিষিক্ত-ফুল্লকুমুদ, অরুণ-ভাতি, চন্দ্রমা-কান্তি, নাতিশীতোষ্ণ-বিহারভূমি। তুমি আমি বলিতে গেলে বলিব—তাহার উপমার উপকরণ সংসারের মধ্যে নাই, ভাষায় তাহার অভিব্যক্তি হয় না, ভাবুকের ভাবে কুলায় না!—সে অফুরন্ত, অনন্ত সৌন্দর্য্য! সেইখানেই আছে, সেইখানেই তাহার সৃষ্টিস্থিতিলয়, সেই আদি, সেই মধ্য, সেই অন্ত। অনেক খুঁজিয়া দেখিয়াছি, অনেক ভাবে বুঝিয়াছি, অনেক মাথা খাটাইয়াছি, বুঝি তেমনটী আর হইবার নয়, তেমনটী আর কোথাও মিলিবার নয়, তেমনটী

আর কাহারও সঙ্গে মিশিবার নয়। কোন্ মাহেন্দ্রযোগের সংযোগে সংযোগ হইয়াছিল, কোন্ কর্ম্মফল প্রসন্ন হইয়াছিল, ভাগ্যবিধাতার কোন্ ভ্রমের কারণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাই তাহা একদিন আমার ভাগ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল! আর আমি অমনি পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক ভুলিয়াছিলাম—আত্ম-বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাহাকে পাইয়াই যেন আপনাকে আপনি ভুল করিয়াছিলাম। ইহা কি একটা তন্ময়তা? কে বলিবে? এত মাদকতা অপর কিছুতেই দেখি নাই! সে আমার চরিত্র দেখিয়া কত ভর্ৎসনা করিয়াছে, কত তিরস্কার করিয়াছে, কত পাপপুণ্যের ভয় দেখাইয়াছে, হাসিয়াছে, কাঁদিয়াছে, দূর করিয়াছে, নিকটে আসিয়াছে, জোড়কর করিয়াছে, পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়াছে। আমিও তাহাকে তাই করিয়াছি—কখন ভয় দেখাইয়াছি, কখন অভয় দিয়াছি, কখন পদাঘাত করিয়া খেদাইয়াছি, কখন বা বুকের ভিতর টানিয়া আনিয়া—তাহাকে হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী প্রতিমা ভাবিয়া—সোহাগ-আপ্যায়ন করিয়াছি। সেও আমাকে ক্ষমা করিয়াছে, আমিও তাহাকে পূজা করিয়াছি। ইহাকে তন্ময়তা না বলিয়া কি বলিতে পারি? ইহা প্রকৃতি-প্রদত্ত না ভাবিয়া কি ভাবিতে পারি? ইহা যে মাত্র আমার, তাহা নহে। জগতের ঘরে ঘরে—জনে জনে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি—সকলেরই মুখে আমারই মত এক কথা, সকলেরই অবস্থা আমার মত, সকলেই এইরূপ আমার মত প্রলাপ

বকিতে থাকে, সকলেরই তাহা ঋদ্ধি-সিদ্ধি-যোগ। সে সব ভুলাইয়া দেয়, সে সব স্মৃতির সম্মুখে আনিয়া ধরে, সে সর্প হইয়া দংশন করিতে পারে—সে আবার রোজা হইয়া মৃতকে বাঁচাইয়া তুলে। তাহার সব সুন্দর! "সেই মুখখানি" যাহার—তাহার সব সুন্দর! তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হস্তপদ—যা বলিবে—সব সুন্দর। এমন কি তাহার নামশ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শন পর্য্যন্ত সুন্দর! মহাকবি ভবভূতি তাঁহার প্রণীত "উত্তর রামচরিতে" তাহার স্পর্শমাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য অযোধ্যা হইতে শ্রীরামচন্দ্রকে অরণ্যে আনিয়া মূর্চ্ছিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনা—সূক্ষ্মতমসা পূর্ব্ব হইতেই অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী জনকনন্দিনী মা সীতার সহচারিণী হইয়াছিলেন—তিনিই মাতাকে পরামর্শ প্রদান করিলেন—"সখি! প্রভু রামচন্দ্রের সংজ্ঞা রহিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি স্পর্শ না করিলে কিছুতেই আর্য্যপুত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিবেন না।" মাতা স্পর্শ করিলেন—অমনি প্রভুর চৈতন্য আসিল, কহিলেন—

> "প্রচ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং
> নিষ্পীড়িতেন্দু করকন্দল জোন্নুসেকঃ।
> আতপ্ত জীবন মনঃ পরিতর্পনোমে
> সঞ্জীবনৌষধিরসোন্নু হৃদি প্রসিক্তঃ।"

ইহা কি কল্পবৃক্ষ-পত্রের রসক্ষরণ কিম্বা নিষ্পীড়িত-চন্দ্র-কিরণসমূহজ সুধাক্ষরণ? অথবা সীতা-বিরহসন্তপ্ত মদীয়

মনের আনন্দদায়ক সঞ্জীবনী ঔষধ আমার হৃদয়ে সিঞ্চিত হইতেছে? সত্যই ইহার একটী বর্ণবিন্যাসও ভ্রান্তিসঙ্কুল নহে। যাহাই হউক, কবি "সেই মুখখানি"কে লইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহাকে সমধিক যে ভালবাসেন, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। তাহার অদর্শনে প্রাণের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার প্রাণের সকল কথাই মুক্তধারার মত বাহির হইয়া গিয়াছে। যখনই সেই মুক্তধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তখনই তোমাকে আমাকে পাগল করিয়াছে! এই ত মানব প্রকৃতির একটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। এক সরলতা দেখিলেই প্রাণ আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। প্রাণ যেন তাহারই সহিত মিশিতে চেষ্টা করে। বুঝাইলেও সে বুঝে না, বলিলেও সে শুনে না। বালক-বালিকার প্রাণ অতি সরল, তাহাতে কুটিলতা নাই, স্বার্থপরতাও নাই, স্বচ্ছ জাহ্নবীর সলিল যেন চল চল করিতেছে, তাই অতিবড় পাষণ্ডও তাহাদের না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। বুঝি তাই বালক-বালিকার কথাগুলি পর্য্যন্ত অমৃতবৎ। কবি যখন নিজের প্রাণকে সরল করিয়া—প্রাণ দিয়া কাব্য লিখিয়া থাকেন, তখন তাঁহার কাব্য সজীব, মাদকতাময়, তাহার সৌরভ আকুলতাপূর্ণ, কি যেন আকর্ষণী শক্তি আসিয়া তাহার মধ্যে পাঠকের প্রাণকে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ইহার কারণ কি?—কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? আমার মনে হয়, আমি যাহা চাই—তাহাই পাইয়াছি, প্রার্থিত বস্তু

পাইলে মনের যে অবস্থা, তাহার আনন্দে যে আনন্দ—তাহাতে যেন বাহ্য জগৎ ভুলিয়া যাই। ইহাতেই মনে হয়না কি—আনন্দ জিনিষটা জড়জগতের নহে, অন্তর্জগতের একটা হিল্লোল! সে হিল্লোলে ভাসিবার জন্যই বসন-ভূষণ পরিধান করি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালবাসি, সঙ্গীত-আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকি। কেবল আমি নহি, আমার প্রবৃত্তিও ঐ চায়। আচ্ছা বল দেখি—আমরা যাহার জন্য আকাঙ্ক্ষিত—সেই আনন্দ জিনিসটা কি? কেন জীবমাত্রেই সেই আনন্দ লাভের পিপাসু? কেহ বলিবেন,—আনন্দই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতেই বিরাটের সৃষ্টি। আমরা সেই বিরাটের অন্তর্ভুক্ত—তাই আনন্দ আমাদের প্রিয়বস্তু, তাই আনন্দই আমাদের জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য। কেহ বা বলিবেন,—আনন্দ মনের একটা অবস্থা বিশেষ মাত্র, কেন না মনই সুখ দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে বলিব? বিষয়ের সহিত যে আমরা আনন্দ উপভোগ করি, তাহা কি আত্মা গ্রহণ করেন না?— নিশ্চয়ই করিয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শন মতে বিষয়-জ্ঞান বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগে হয়, চক্ষুরাদি তাহা ইন্দ্রিয়াদির নিকট প্রেরণ করে, আবার ইন্দ্রিয়গণ মনের নিকট, মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নিকট লইয়া যায়, তখন আত্মা তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন; তখন বিষয়—যে উপায়ে এবং যে যে পথ দিয়া আত্মার নিকট আগমন করে; আত্মা সেই সেই উপায় এবং সেই সেই পথ দিয়া তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ প্রদান করেন,

এইরূপে বিষয় গৃহীত হইয়া থাকে; তাহা হইলেই আনন্দ মাত্র মনের ক্রিয়া বা অবস্থা নহে। আনন্দের সহিত আত্মার সম্বন্ধ আছে এবং সেই আত্মার সহিত পরমাত্মাও সংশ্লিষ্ট। এখন বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীতি হইবে, সেই পরমাত্মা ভিন্ন জগত নহে। সেই আনন্দময়ের আনন্দ জগতে পরিব্যাপ্ত, তাহা বিষয়ে সংলিপ্ত থাকিয়া আমাদিগকে বাহ্য বস্তুতে ভুলাইয়া রাখে। আমরা তাই তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়ি; মন তাঁহার দূতের কার্য্য করে।

এক কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়াছি। অহো!—আমি যে "সেই মুখখানি"রই কথা বলিতেছিলাম! যে মুখখানিতে জড়জগৎ—অন্তর্জগৎ সকলই নিহিত, যে মুখখানিতে অনাদি নিয়ন্তার যাবতীয় প্রতিভা প্রতিফলিত, যাহাতে দার্শনিকদিগের চিত্তের স্থিরতা—জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবৃত্তি—অধ্যাত্মপ্রসাদ—সংযমে বিরাট জ্ঞান—ভূতজয়—কৈবল্যপাদ—প্রকৃতি ও পুরুষের মুক্তি—ক্লেশ ও অর্থের নিবৃত্তি ইত্যাদির উপায় সকল নিহিত রহিয়াছে, সেই স্বর্গতুর্লভ, হাসিভরা শারদীয়া জ্যোৎস্নাময়ী নববসন্তে ফুল্ল কোমল-কুসুমময়ী মুখখানি, যাহাতে আকাঙ্ক্ষার শেষ, বাসনার তৃপ্তি, উদ্দীপনার সমাধি, সকল কার্য্যের নিবৃত্তি, সেই সংযমতাময়ী—প্রেমময়ী—ভাবময়ী—শান্তিরাজ্যের রাজরাজেশ্বরী—করুণাময়ী মুখখানি কবি হারাইরা ফেলিয়াছেন! কিন্তু স্মৃতি তাহা হারাইতে দেয়

নাই। কবিকে উন্মত্ত করিয়া, তাঁহার মুখে প্রলাপবাক্যের মত অনেক বাক্য বলাইয়াছেন। উন্মত্ত কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমিও উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছি! "আ মরি আ মরি" করিয়া আমিও প্রলাপ-বাক্যবিন্যাস করিতেছি—তাঁহার কথার উপরও কথা চালাইতেছি—পাগলামীর উপর আরও পাগলামি করিতেছি। আহা রে! কবি যে আমাকেও পাগল করিয়াছে!

"সেই মুখখানি" ভুলিতে পারিতেছি না—তাই একটা বিষয়। সেই বিষয়—মনোদূত টানিয়া লইয়া যাইতেছে—বিশাল অন্তর্জগতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। উঃ—কি তাহার গতি! থাক দূত, থাক, একবার তোমায় আমায় একস্থলে দাঁড়াইয়া—"সেই মুখখানি" চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লই। তাহার মুখখানিতে যাহাই থাকুক—সুধা-বিষ, সুখ-দুঃখ, প্রেম-হিংসা, করুণা-নিষ্ঠুরতা, জয়-পরাজয়, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, আদি-অন্ত, সৃষ্টি-লয়, ব্রত-উদ্‌যাপন, যজ্ঞ-দক্ষিণা, চৈতন্য-জড়, উদয়-অস্ত, মুক্তি-বন্ধন প্রভৃতি যাহাই থাকুক—তবু একবার তাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিব; একবার তাহাকে বুকে রাখিয়া দেখিব। তাহাকে অনেকদিন ধরিয়া দেখিয়াছি, সে আমাকে দেখার মত অনেক দেখাইয়াছে, আমিও দেখিবার মত অনেক দেখিয়াছি, আজ তবে ভাল করিয়া না দেখিব কেন? সে-ই বা আমায় ভাল করিয়া না দেখাইবে কেন? সে যে আমায় ভালবাসে, আমিও যে

তাহাকে ভালবাসি। বিনা আদান-প্রদানে সে ভালবাস জন্মে না, প্রাণে প্রাণে প্রাণ বিনিময় করিতে হইয়াছে চোখে চোখে অদল বদল করিয়াছি। দুইটী যেন একটী হইয়াছিলাম, তবে সে এখন আর একটী হইয়া গেল কেন কে বলিবে? কোন্ দুঃখে, কোন্ অভিমানে, কোন্ ক্রুটীতে কোন্ সেবাপরাধে, কোন্ জ্বালায়, কোন্ অশান্তিতে সে আমার এমন করিল গো! বুঝিল না—প্রাণের জ্বাল বুঝিল না! মনের মতন হইয়া মন হইতে সরিয়া গেল দূরে—দূরে—"সেই মুখখানি!" ধীরে—ধীরে—দূরে—দূরে —"সেই মুখখানি!"

ঐ উঁকি দিয়া দেখিতেছে, যেন কাল মেঘের কোল হইতে জ্যোৎস্না সরিয়া যাইতেছে; যেন বিশাল সাগর-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে; যেন মলয় বায়ুর মত সে মৃদু মৃদু বহিয়া যাইতেছে; যেন মর-জগতের কোলাহল সহ্য করিতে না পারিয়া, কোন অজ্ঞাত রাজ্যে যাইবার জন্য মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপ করিতেছ! তবু সে স্মিতাননা, তাহার চিরহাসি সে ভুলিতে পারিতেছে না তাহার স্বভাব সে কেমন করিয়া ভুলিবে? সে দুঃখেও হাসিয়াছে, সুখেও হাসিয়াছে, তাহার হাসির যে বিরাম নাই! সে সংসারে হাসি লইয়া আসিয়াছিল, সংসারের বাহিরে যাইবার সময় তাহার তেমন হাসি কোথায় রাখিয়া যাইবে? তাহার হাসি রাখিবার তেমন পবিত্র স্থান কৈ? যেখানে

মানুষে মানুষে—পশুতে পশুতে—কীটে পতঙ্গে নিত্য সংঘর্ষ, যেখানে চির-অশ্রু চির-প্রবাহিত, যেখানে আত্মাভিমান বিরাটকেও ছোট করিতে চায়, যেখানে অভাবের চিতার আগুণ চির-প্রজ্বলিত—ধূ ধূ জ্বলে, যেখানে শোক-রোগের হা-হা যন্ত্রণা, যেখানে জীবন্তে দগ্ধ করিয়া ফেলে, যেখানে আপন পর বিবেচনা করিবার সামর্থ্য সংকুলান হয় না, হিংসায় হিংসায় শুকাইয়া যায়, যেখানে কেবল বাদ-প্রতিবাদ, কেবল বিতণ্ডা, —একটা স্থির সঙ্কল্পকে স্থায়ী হইতে দেয় না, ক্ষণে ক্ষণে চিত্তের অস্থিরতা ঘটাইয়া থাকে, যেখানে প্রাণের আনন্দকেও একটা অস্থাবর পদার্থ বলিয়া ভ্রম জন্মে, তেমন জ্বালাময় অপবিত্র স্থানে সে তাহার তেমন শুভ্র মধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিশুদ্ধ হাসিটী কোথায় রাখিয়া যাইবে? সে যে ঠেকিয়া শিখিয়াছে!

যাও—যাও—ধীরে ধীরে—দূরে চলিয়া যাও! আমি চক্ষের পলক ফেলিব না, দেখিব—যতটুকু দৃষ্টি চলে, ততটুকু তোমায় প্রাণ ভরিয়া দেখিব। কৈ—যাও দেখি? যাইতেছ না কেন? কি বাধা পাইতেছ? দাঁড়াইলে কেন? স্থির-নিশ্চল-নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপের আলোক-রশ্মির মত জ্যোতির্ম্ময়ী প্রাণাধিকে! কি হইল? কাহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছ? আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ কেন? এই যে তোমার বিরহে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতেছিলাম, স্মৃতি আসিয়া আলোক-বর্ত্তিকা ধরিল, অমনি দেখিতে পাইলাম, যাহা দেখিতে পাইলাম—তাহা ত

অতি অদ্ভুত! তুমি ত আমায় ভুল নাই, তুমি যে অতীতের অপেক্ষা বর্ত্তমানে অতি মধুর সাজে সজ্জিত হইয়াছ? যাও— যাও—তবুত যাইতেছ না! একি!—চতুর্দ্দিকেই যে "সেই মুখখানি।" যেই দিকে চাই, সেই দিকেই—"সেই মুখখানি!" তাই কি কবি বলিয়াছেন—

"সঙ্গমবিরহ বিকল্প বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য,
সঙ্গমেঽপিভবদেক স্ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।"

মিলন এবং বিরহ উভয়ের মধ্যে বিরহই উত্তম, কেন না মিলন সময়ে একমাত্র তাহাকেই দর্শন করি, কিন্তু বিরহ সময়ে ত্রিভুবন তন্ময় অর্থাৎ তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত দর্শন করি। তাহাই ত হইতেছে, আজি যাহার জন্য আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলাম, যাহার জন্য পাগল হইয়াছিলাম, যাহাকে ভুলিব বলিয়া ভাবনা আসিয়াছিল, যাহাকে দূরে দূরে দেখিতেছিলাম, স্মৃতি যাহা— "সেই মুখখানি" বলিয়া আমাকে দেখাইতেছিল, সে ত আর তাহা নাই! সে যে আমার সম্মুখেই রহিয়াছে; জগতের সকল জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া, ত্রিভুবনের আনন্দরাশি মাথায় করিয়া, আমাকে উপহার প্রদান করিবার জন্য—আমারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'লও' 'লও' বলিয়া অনুরোধ করিতেছে। তাহাতে যেন বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে, কত চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রের উৎপত্তি-বিলয় সংঘটিত হইতেছে, কত ইন্দ্রপাত হইতেছে, কত ইন্দ্র আবার উদয় হইতেছে, কত নন্দন-পারিজাত ঝরিতেছে, কত ফুটিতেছে, কত গঙ্গা শুকাইতেছে, কত কল কল নাদে বাহিত

হইতেছে ; তাহা যেন শক্তির মহাপীঠ, ভক্তির লীলাক্ষেত্র ! সে কোথায় ? সে যে—"এই" !—চোখে চোখে রহিয়াছে ! দূর দূর করিতেছি, তবু সে নড়িতেছে না !—চক্ষের তারার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তবে কবি ! এখন বল দেখি,—"সেই মুখখানি" বলিয়া ভুল কর নাই কি ? "সেই" না "এই ?" যাহাই হউক, তোমার "সেই মুখখানি" দেখিলাম, তুমি আমার "এই মুখখানি" দেখ ! আমি তাহাকে "এই" দেখিতেছি।

পার্থিব প্রেম।

যাহা পৃথিবী সম্বন্ধীয়—তাহাই পার্থিব। সেই পৃথিবীর বনীয়াদ—প্রেম। প্রেম না থাকিলে পৃথিবী হইত না। মনে হয়, সেই প্রেমের বুদ্‌বুদে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রেম আছে বলিয়াই পৃথিবী আছে, উহার পরম্পরা রক্ষিত হইতেছে। সেই প্রেম যেন আকর্ষণ, সম্মোহন, সম্মিলন। "একোঽহম্ বহুস্যামঃ" এই যে সৃষ্টির আদিতত্ত্ব, ইহা যাহার বা যে শক্তির প্রভাবে পুষ্ট হয় এবং সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ ভাবে বজায় থাকে, তাহাই বা সেই শক্তিই প্রেম।

কি জানি—এ কিসের পিপাসা! এই যে তোমাকে আমার করিবার আকাঙ্ক্ষা—এই যে তোমাকে আমার করিবার তীব্র বাসনা, জানিনা—ইহা কোন্ পিপাসা হইতে উদ্ভূত; জানিনা—ইহা কেন হয়? কিন্তু এই সাধ—সৃষ্টবিশ্বের সজীব ও নির্জীব সকল বস্তুরই অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য। ঐ দেখ—সৌরমণ্ডলের মধ্যে বিরাট্ পুরুষের ন্যায় সূর্য্য অবস্থান করিতেছেন আর অগণিত গ্রহ ও উপগ্রহ সকলকে অহরহঃ কেবল নিজের দিকেই টানিতেছেন। গ্রহগণও সূর্য্যের বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে পারিতেছে না, তাই যেন তাহারা অভিমানে সূর্য্যদেবের চারিদিকে কেবল ঘুরিতেছে—অবিশ্রান্ত গতিতে ঘুরিতেছে। ঐ দেখ—বৃক্ষ শাখায় পক্কফল আলম্বিত, ভগবতী

ধরিত্রী উহাকে আকর্ষণ করিতেছেন, হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া রাখিবার জন্য প্রতিনিয়ত যেন আবেগকম্পিত বক্ষ পাতিয়া রাখিয়াছেন! এই ভাবে যে দিকে যখন তাকাইবে, দেখিবে—বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই এই একটা তীব্র আকর্ষণ—এই একটা গম্ভীর আহ্বান। কোকিল কূজনে, ভ্রমর গুঞ্জনে, অরণ্যের বিতানে, বিদ্যুদ্বিকাশে, মেঘাড়ম্বরে, জগতের সর্ব্বব্যাপারে প্রকৃতির গাত্রে এই প্রাণের কথা, অন্তরের রহস্য যেন প্রতি মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিতেছে।—ইহাই প্রেম।

জলের বুকে পদ্ম ফুটে—প্রেমের জন্য। আকাশে চাঁদ উঠে—প্রেমের জন্য। মলয়-মারুতের স্নিগ্ধ প্রবাহ ছুটে—প্রেমের জন্য। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম—গলিত ধাতুর ক্ষরিতস্রাব—বিলাস-বিহ্বলাচকিত-চঞ্চলা সৌদামিনীর ক্ষণ-হাসিও যেন প্রেমের লালসায় ফুটিয়া বাহির হয়, হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া বেড়ায়। মেরুসংলগ্ন তুহিনরাশিও যেন প্রেমের তন্ময়তায় জমাট হইয়া গিয়াছে। প্রেম ছাড়া আর কিছুই নাই; প্রেম ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। পৃথিবীবাসী—সজীব, নির্জীব, স্থাবর ও জঙ্গম সকলেই যেন প্রেমের দাস এবং প্রেমের উপাদানে গঠিত; প্রেমই সৃষ্টির আদি ধাতু এবং আদি শক্তি।

জীবজগতের মধ্যে দেখিতে পাই, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নানা জীবের মধ্যেও প্রেম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।

মানুষের ত কথাই নাই। মানুষ কখনও একাকী থাকিতে পারে না, কি জানি কি রকম একটা বোধ হয়, তাই আর একটা চায়। যে যাহাকে চায়, তাহাকে তাহার প্রেম-ভাব বলিব না ত বলিব কি? কেন না, আগেই বলিয়াছি—প্রেম জগতের একটা মহা-আকর্ষণ। সে তোমাকে আমাকে লইয়া তাই সদা-সর্ব্বদা টানাটানি করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুরই সহিত মিশাইয়া দিতেছে; তাই আমরা একটা লোষ্ট্রকেও ভালবাসি। সেই ভালবাসারই মহাপ্রাণ—প্রেম। সেই প্রেমের সাহায্যে হয় তোমাকে আমি আমি-ময় করিয়া লই, নয় ত আমাকে তোমাতে ডুবাইয়া আমি তুমিময় হইবার চেষ্টা করি।

অন্নপূর্ণার দ্বারে শিব ভিখারী। ভিখারীর ভিক্ষা কি জান? যে প্রেমে তাঁহার জগৎ রচনা, যে প্রেমের কণিকায় চরাচরবাসী জীবজন্তু উদ্ভূত, সেই প্রেমের আদিরূপিনী প্রেমময়ী যখন প্রেমের মধুর ভাব লুকাইয়া ভক্তির কেন্দ্র-রূপিনী জননীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তখনই শিবময়—প্রেমময় শিবমূর্ত্তি তাঁহার সেই প্রেমের কণিকা লাভের নিমিত্ত তাঁহারই কৃপার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রার্থনা অন্য কিছু নহে—তাঁহার প্রেমময়ীর নিকট আবার ভিক্ষা কি? যাহাতে মা আমার পূর্ণা, যাহাতে মা আমার আদরিণী—গরবিণী—বিশ্ব-সোহাগিনী, তিনি—সেই বিশ্বের আদিশক্তি প্রেমশক্তিরই কণিকা প্রয়াসী হইলেন। অন্ন যেমন জীবের জীবন,

তেমনি বিশ্বেরও জীবন—প্রেম। তাই শিবময় ভোলানাথ বিশ্ববাসীর নিমিত্ত সেই প্রেমপ্রার্থী। প্রেমময়ী,—আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা মা আমার বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই স্নেহের স্থালী হাতে করিয়া পরমানন্দে প্রেমদান করিতেছেন। কোটি কোটি নরনারী কেহই তাঁহার সে কণিকায় বঞ্চিত হইতেছে না। যে চাহিতেছে, সে-ই পাইতেছে! প্রেমময়ীর প্রেম যে অনন্ত মহাসাগর! তাহা কি ফুরাইবার? উহার আদি নাই, অন্ত নাই, উহা অগাধ—অপরিমেয়। অনন্তকাল সে সাগরে ডুবিয়া থাকিলেও তাহার তল পাওয়া যায় না, কারণ উহা যে অতল; সাঁতার দিয়াও সে সাগর পার হওয়া যায় না, কারণ উহা যে অসীম। প্রেমের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রেমময় আর প্রেমময়ী না হইলে কে দেখাইবে?

জ্ঞানময় স্বয়ম্ভূ শুধু এই ভাবটুকু দেখাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না! তিনি যে প্রেমের ভিখারী, যাহার জন্য অন্নপূর্ণা মায়ের দ্বারের দ্বারী, সেটুকু সম্পন্ন করিয়াও স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রেম-সাগরে ডুবিয়া থাকিবার জন্য প্রেম-ময়ীর সহিত মিলিত হইলেন। দুটী একটী হইল, হইল কি?—

অর্দ্ধনারীশ্বর—অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। সেই অপূর্ব্বমূর্ত্তি জীবকে যেন স্পষ্ট বলিতেছে—তুমি ও আমি এক হইব। আমি তোমাময় হইব, তুমি আমিময় হইবে। আমি তোমাতে ডুবিয়া থাকিব, তুমি আমাতে ডুবিয়া থাকিবে। এই ত

প্রেমের শেষ, এই ত প্রেমের মহামিলন! কিন্তু তাহা কৈ? সে প্রেম যে পার্থিব জগতে বিরল—দুষ্প্রাপ্য। তাহারই অভিজ্ঞান—অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি! তাই মনে হয়—উভয়ের বৈশিষ্ট্য ধুইয়া মুছিয়া এক হইতে পারিল না। অর্দ্ধেক পুরুষ অর্দ্ধেক রমণী রহিল। আমি তোমায় ভালবাসি বলিয়া—নির্নিমেষ নয়নে অহরহঃ তোমায় দেখিতে চাহি বলিয়া—তোমার অর্দ্ধেক আমাতে সংলগ্ন রহিল; আবার তুমি আমায় ভালবাস বলিয়া—মীনের ন্যায় পলকহীন নয়নে আমায় দেখিতে চাহ বলিয়া—আমার অর্দ্ধেক তোমাতে সংলগ্ন রহিল। ভালবাসার আদান প্রদানে এই যে আপোষ, একীকরণে এই যে সামঞ্জস্য, ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর—ইহাই হরগৌরীর মহামিলন—অদৃষ্ট প্রেমমূর্ত্তির অপূর্ব্ব উজ্জ্বল প্রতিমা! উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম সমান বলিয়া উভয়ের বৈশিষ্ট্য অর্দ্ধেক করিয়া উভয়ে সংলগ্ন। প্রেমের এমন আদর্শ নির্ম্মল দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে, আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। প্রেমের কেন্দ্র ভারতভূমি, তাই এখানে এমন অতুল প্রতিমা পরিস্ফুট হইয়াছে।

আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকেই আমার করিতে চাহি। ভালবাসি কাহাকে? যে আমার মত—তাহাকেই। যাহাকে পাইলে আমার অভাব দূর হয়, আমার প্রাণের পিপাসার নিবৃত্তি হয়, কি জানি কি একটা তৃপ্তির ভাব হৃদয়ে প্রসারিত হয়, আমি তাহাকেই চাই, তাহাকেই ভালবাসি। "আমার

অৰ্দ্ধনারীশ্বর।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

কিসের অভাব” এই প্রশ্নটার উত্তর আজ পর্য্যন্ত কেহই দিতে পারে না। পথের কাঙ্গালের যেমন অভাব, কোটীশ্বরেবও তেমনি অভাব; তাই রাজ্যেশ্বর হইয়াও সিদ্ধার্থ সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন, তাই স্বচ্ছলতার মধ্যে থাকিয়াও—যোড়শীর পতি হইয়াও—জননীর নয়নমণি হইয়াও নিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কি জানি—কিসের অভাব! এ অভাব ধনৈশ্বর্য্যে দূর হয় না, রাজ্য-সম্পত্তিতে দূর হয় না, যোড়শী সুন্দরী ললনা পরিবৃত হইয়া থাকিলেও দূর হয় না, বিলাসে উহা অপসারিত হয় না, হইলে বিল্বমঙ্গলকে পথের বাহির হইতে হইত না। অথচ আবার এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা নারীর রূপে মুগ্ধ থাকেন, অর্থ সঞ্চয়ে প্রমত্ত থাকেন, রাজ্যৈশ্বর্য্যে ডুবিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের কোনকালে কোন অবস্থায় তৃপ্তি হয় কি? তৃপ্তি হয় না,—হইবার নহে বলিয়াই তাঁহারা সংসারের সর্ব্বস্ব লইয়া আশু সুখে সুখী হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টায় অভাব দূর হয় কি? কি জানি—কি চাহি?—কি জানি—কি হারাইয়াছি—তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। কি জানি—কি হইলে আমার সাধ মিটে, পিপাসা ছুটে, মনের ধোঁকা টুটে! এই যে কি জানি—কিসের অভাব, ইহাই জীবের অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তি বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এই অতৃপ্তি হইতেই মাধ্যাকর্ষণ, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতীগ শক্তি, জড় ও জীব সকলের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও সংহৃতি। এই অতৃপ্তি হইতেই প্রেম, ভক্তি, স্নেহ,

ভালবাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য, মায়া, মমতা, বাৎসল্য উৎপন্ন হইয়াছে; এই অতৃপ্তিই সংসার, উহাই সংসারের সার, সংসারের মোহ, সংসারের সর্ব্বস্ব। কোনও দেশের কোনও জাতির মনিষী কবি ধর্ম্ম-ব্যাখাকার এই অভাব বা অতৃপ্তির বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। সকলেই বলিয়াছেন, উহাই দুঃখের মূল। এই দুঃখ দূর করিয়া কি জানি—কি একটা কিছু পাইবার জন্যই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে হয়, সন্ন্যাস ও সংযম অবলম্বন করিতে হয়, রসের সাগরে ডুবিয়া তাহারই তরঙ্গে গা ভাসাইয়া যাইতে হয়।

বলিয়াছি ত আমারই মত যাহা, তাহাকেই আমি ভালবাসি। তবে কথা এই—আমি আমাকেই চিনি না, আমাকেই জানি না, অথচ বড় সাধ হয় যে, আমার যাহা কিছু তাহা চিনিয়া রাখি—বুঝিয়া রাখি—জানিয়া রাখি। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। চিনিব কি করিয়া? বসন্তোল্লাসে যখন প্রকৃতি পেলবকিশলয়ময়ী হইয়া উঠেন, তখন ত তাঁহাতেই স্বর্গরাজ্যের সুষমা কল্পনা করিয়া আত্মপ্রাণ ঢালিয়া দিই, কিন্তু তাঁহার সে রূপে কি তাঁহাকে চিনিতে পারি? দেখি—চক্ষু ভরিয়া দেখি, যত দেখি—ততই তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, ততই সাধ বাড়ে, তবু যেন মনে হয়, আহা হা কি দেখিলাম, এমনটী যে কখনও দেখি নাই, পিপাসা যে আর মিটে না! তখনই মনে হয়, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছিলেন—

"জনম অবধি হাম, ও রূপ নেহারিনু—
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

জনম কাটিয়া গেল, তবু নয়নের তৃপ্তি ঘটিল না। কি সে রূপ—কে—সে? তাহার সৌন্দর্য্যে আমি বিভোর, আত্মহারা; পাগলের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছি! আমি আমাকে চিনি না এবং জানি না, তথাপি পরকে আপন করিতে চাহি। আমা ছাড়া স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিকে প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয় করিয়া রাখিতে চাহি। কেন চাহি, তাহা কেহই বলিতে পারে না—কখনও পারিবে না। এই কথাতেই আর এক প্রেমিক কবির গীতি স্মৃতিতে আসে—

"ভালবাসিবে ব'লে তোমায় ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এমন, তোমা বই আর জানিনে॥"

উহাই মানুষের সনাতনী প্রকৃতি। ইহাই ত অহৈতুকী প্রেম। এ প্রেমে ভালবাসার আবিলতা নাই, আবর্জ্জনা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, আশা পিপাসা কিছুরই অভিজ্ঞান নাই! স্বচ্ছ—দর্পণের মত স্বচ্ছ—স্ফটিকের মত স্বচ্ছ—শারদ বাসন্তী পৌর্ণমাসী-রজনীর মত স্বচ্ছ।—তাহার স্বরূপ উদাহরণ ভাষায় নাই, ইহার বর্ণনা করিতে গেলে ভাষা মূক হইয়া যায়।

এই প্রেমই অপার্থিব, আত্ম-সম্মিলনের মূল। বিল্বমঙ্গল বেশ্যার প্রেমে মুগ্ধ ও আপনহারা ছিলেন। বেশ্যার প্রেম হইলে কি হয়? বিল্বমঙ্গল আপন মনপ্রাণ বিকাইয়া বেশ্যা

চিন্তামণিকে ভালবাসিতেন। সে ভালবাসা বাধা-বিঘ্ন মানিত না, সে ভালবাসা সর্প এবং রজ্জুতে বিভেদ বিচার করিতে পারিত না, সে ভালবাসা বাতের বিভীষিকায় সঙ্কুচিত হইত না, সে ভালবাসা শিশুর মত সরল, আকাশের মত উদার, ধরণীর মত সহিষ্ণু, গঙ্গাজলের মত পবিত্র, পর্ব্বতের ন্যায় অটল, সমুদ্রের মত গভীর। তাই বিল্বমঙ্গলের প্রেম-প্রবাহ একবার বাধা পাইতেই শতগুণ বেগে প্রেমের সাগর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে গিয়া পতিত হইয়াছিল!

প্রেম অব্যক্ত ও অদৃষ্ট। সে প্রেম-সাগরে কেমন রূপের তরঙ্গ খেলিতেছে! একে রূপ অব্যক্ত—তখন তাহার আলম্বন ভাব তোমায় কেমন করিয়া বুঝাইব? সে যে দূরবগাহ—তাহার তল কোথায়—কি করিয়া বলিব? আমি যাহার কথা বলিতেছি—তাহার পঞ্চ মূর্ত্তি। এক এক মূর্ত্তি ভাবিলে—অমনি তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়! তাহা বাক্যে বুঝাইতে পারিব না। আকার—ইঙ্গিতে মাত্র কতকটা পরিস্ফুট হইবে। বলিব কি? প্রেমিক—ভাবুক—দূরদর্শী দার্শনিকের বহু গবেষণায় যাহার কতকটা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার আভায দিই—শুনিয়া যাও। সে পঞ্চ মূর্ত্তির নাম—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর। ইহাদেরই সমষ্টি—প্রেম। এই প্রেমে—তুমি—আমি—বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে ডুবিয়া রহিয়াছি। এ কথাটা বলিলাম কেন, বুঝাইবার আবশ্যক হইবে কি? সংক্ষেপে বলিয়া যাই, পাগলের

প্রলাপ কি মিষ্ট লাগিবে না? লাগিবে বই কি। তাহা না হইলে কোটি কোটি লোক একটা পাগলের মুখের পানে চাহিয়া থাকে কেন? তাহার অসম্বদ্ধ বাক্যাবলী উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করে কেন? আমিও তেমনই একটা পাগল। এস, এস, কোটি কোটি নরনারী, আসিয়া শুনিয়া যাও— আমার প্রাণের—আমার হৃদয়ের—একটা অসম্বদ্ধ কাহিনী। ভুলি নাই ত? যাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, যাহার পূর্ব্বাভাষ দিয়াছিলাম, যাহা আবেগের তরঙ্গে তুলিয়া চীৎকার করিতেছিলাম, তাহা ত ভুলি নাই! সেই প্রেম—যাহা মোহন সৌম্যমূর্ত্তিরূপে, যাহা দাসদাসীতে, যাহা জনক-জননীতে, যাহা বন্ধুবান্ধবে, যাহা প্রণয়প্রণয়ীতে গা ঢালিয়া —প্রাণ ঢালিয়া—অনন্ত বিশ্বকে ভালবাসিয়া আসিতেছে, যাহা বিপদে সম্পদে—সুখে দুঃখে—আনন্দে শান্তিতে— বিরহে মিলনে উপভোগ করিয়া আসিতেছি, যাহা স্বপনে জাগরণে—প্রত্যক্ষে পরোক্ষে—নিন্দা সুখ্যাতিতে আলাপ পরিচয় করিয়া আসিতেছি—যাহাতে কল্পনা জল্পনা—বাসনা খাড়া রাখিয়াছি. তাহাই আমাদের পূর্ব্বকথিত পঞ্চমূর্ত্তির সমন্বয়—প্রেম নয় কি? এই প্রেমে কি বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া খেলা করিতেছে না? এ ছাড়া এত বড় বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডটাকে বাঁধিবার মহারজ্জু আর কি আছে? এই প্রেমেই সব। এই প্রেম না হইলে, এই সাজান বাগান শ্মশান হইয়া যাইত। এই যে প্রমোদ উদ্যান—যে উদ্যানে

মল্লিকা মালতী, বেলা, যূঁই, মন্দানিলের সহযোগে নাচিয়া—হাসিয়া—ঢলিয়া পড়িয়া—হেলিয়া দুলিয়া কথোপকথন করিতেছে, যাহা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কমাইয়া আনে, আবেগ দূর হইয়া যায়, তাহা বল্‌কানে পরিণত হইত। এমন যে—তরঙ্গায়িত নির্ম্মল সরসীর কোমল বক্ষ—যাহার দর্শনে আপনা হইতে শরীরের সমুদয় তাপ মুহূর্ত্তে বিদূরিত হইয়া যায়,—তাহা জ্বালামুখীর জ্বলন্ত মুখে আহুতি স্বরূপ হইত, কিংবা উষ্ণতোয়া বৈতরণীর তপ্ততরঙ্গে উৎসর্গিত হইত! তবে হাঁ গা! যে প্রেমের এত বড়াই করিতেছ—সেই অসীম অপ্রমাদ প্রেমে বিরহ কেন? বিচ্ছেদ কেন? বিবাদ বিসম্বাদ কেন? যোগে বিয়োগের চিহ্ন কেন? সে ভরাকে ডুবাইয়া দেয় কেন? পূর্ণকে শূন্য করে কেন? আবার কেহ কেহ তাহাকে সুখের—শান্তির আধার বলিয়া তাহারই গুণ মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। ইহা আমার কথা নহে, তোমার কথা নহে, উন্মাদের কথা নহে; প্রেমিকের কথা—ভাবুকের কথা—যাহারা প্রেমের তত্ত্ব বুঝিতে যাইয়া অকূলে পার হইতে না পারিয়া—একেবারে প্রেম-সাগরে তলাইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কথা—তাঁহাদেরই ভাব—তাঁহাদেরই উচ্ছ্বাস! বলিব না কেন? বলিব—

"বিরহ বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়।
প্রেমতরঙ্গে নানা রঙ্গে কখন হাসায় কখন কাঁদায়॥"

সে হাসায় কাঁদায় বটে, কিন্তু প্রাণে একটা কেমন কি দাগ

রাখিয়া যায়! সে হাসায় কাঁদায় বটে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কেমন একটা কি সুধাময় আবেশ ঢালিয়া দিয়া যায়! সে হাসায় কাঁদায় বটে, কিন্তু হৃদয়ে একটা মণিময় রত্নবেদী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর একটা নির্গুণ—গুণাতীত—অব্যয়—অব্যক্ত—চিন্ময় দেববিগ্রহ স্থাপন করিয়া যায়—আজ আমরা যাহার পার্থিবপ্রেম নামকরণে পূজা করিতেছি।

ব্রাহ্মমুহূর্ত।

সে আজ অনেক দিনের কথা। এখনও সে কথা ভাবিলে শরীর পুলকে নাচিয়া উঠে, সর্ব্বাঙ্গে মহানন্দের মহাতড়িৎ বহিয়া যায়, চারিদিকে আগমনীর মহোৎসবের মহাবাদ্য আপনা হইতেই বাজিতে থাকে, অমৃত-প্রস্রবণ উৎসারিত ধারায় বিরাট্ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে মুহূর্ত্তে প্লাবিত করিয়া ফেলে! আ মরি মরি, সে দিন গিয়াছে, সে ক্ষণ গিয়াছে, সে দিনের আর কিছুই নাই, শত যত্নেও আর তাহাকে ফিরাইতে পারিব না, সে দিনের সকলই গিয়াছে! কাল-বশে দুকূল-প্লাবিনী কলনাদিনী শুষ্ক হইয়া যাইলেও যেমন তাহার ক্ষীণ রেখা রাখিয়া যায়, ক্ষত শুকাইলেও যেমন তাহার কলঙ্ক চিহ্ন থাকিয়া যায়, গীত শেষ হইলেও যেমন তাহার রেশ থাকিয়া থাকিয়া হৃদয় আকুল করিয়া তুলে, সেইরূপ—সেই মধুময় দিনের—সেই-নবারুণ-রাগ-রঞ্জিত-জীবন-উষার আছে মাত্র স্মৃতি—তারই কত আনন্দ—তারই কত শান্তি—তারই কত সুখ—তারই কত ব্যাপ্তি!

বাল্যের কথা নয়—যখন স্নেহভালবাসার নির্ঝরিণী মমতাময়ী জননীর কোমল অঙ্কে থাকিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিতাম, অসম্পূর্ণ আগ্রহের তাড়নায় আকুল-নয়নে কাঁদিতাম, হাসি কান্না বা ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতাম না, যাহার কথা

বুঝিতাম না, তাহার কথা কেন?—তাহার কথা ছাড়িয়া দিই, বাজে কথায় তাহার কথা তুলিব কেন? তবে ইহাও বুঝি, এ সংসারে বুঝিলাম না—কোন্‌টা বাজে আর কোন্‌টা কাজে। যাহার অভ্যুদয় ও তিরোভাব বুঝি নাই, যাহার আনন্দে ও কষ্টে আত্মশান্তি বা আত্মগ্লানি অনুভব করি নাই, যাহাকে বর্ত্তমানে স্মৃতির মন্দিরে দেখিতে পাই নাই, যাহা মোহ-কুহেলিকাময় কেবল তমসাচ্ছন্ন, তাহাকে লইয়া এত নাড়া ঘাটা করিয়া লাভ কি? পাগল বলিবে, বিরক্তি আসিবে, আসল নকল হইয়া যাইবে, মনের কথা বলা হইবে না বা প্রকারান্তরে বলিলেও লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে না।

বাল্যের স্মৃতি, ভাসা ভাসা, তরঙ্গায়িত অনন্ত জলধির এক একটী তরঙ্গ। বীচিমালা যেরূপ দেখিতে দেখিতে অনন্ত বারিরাশিতে আপনার সত্ত্বা মিলাইয়া দেয়, বাল্যের ঘটনাগুলিও সেইরূপ জীবন প্রবাহে মিলাইয়া যায়, তাহা স্মৃতিতে ধরিয়া রাখা যায় না। চন্দ্রাস্তের জ্যোৎস্না-লেখার ন্যায় ডুবু ডুবু বায়ু হিল্লোলে যেন এই জ্বলিতেছে, এই নিভিতেছে, ঐ আবার জ্বলিল, ঐ যা—আবার নিভিয়া গেল!

যদি বাল্যের কথা হইল না, তাহা হইলে ত কৈশোরের কথা বলিতে পারি, তাহা ত মনে থাকিবার কথা। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া বলিব, তখনকার শিক্ষা ত অনেক! তাহার কয়টা স্মৃতিতে রাখিতে পারিয়াছি? তখন কত আশা

আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত করিয়া, আশার উপর আনন্দ, আবেগ, মোহ চাপাইয়া দিয়া কত মূর্ত্তি গড়িয়াছি, আবার তাহা হতাশার বিশাল বারিধিতে বিসর্জ্জন দিয়াছি, কত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াছি, আবার যথার্থ পন্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই যাহা ভাল বুঝিয়াছি, পরক্ষণেই তাহা আবার হলাহল বোধে পরিত্যাগ করিয়াছি। আকাশের গাঢ় মেঘকে যেমন ঘোর ঝঞ্ঝায় খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে, শেষে আর তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায় না, তেমনি কৈশোরের কত ঘটনা যে কতরূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, কত কল্পনা যে ধূলিকণার সহিত মিলিয়াছে, কত সৌধমালা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কত অঙ্কুর যে অকালে শুকাইয়াছে, কত আশার মধুর বীণা যে বাজিতে বাজিতে থামিয়া গিয়াছে, কত রাগিণী যে তালে তালে ভাঙ্গিয়াছে, তাহার কয়টী বলিব? তাহার কয়টা কথা স্মৃতিতে রাখিতে পারিয়াছি? যে কয়টা তখন বড় উৎকট অন্ধ আবেগে চাপিয়া ধরিয়াছিল, সেই কয়টা নয় "নাছোড়-বান্দা" হইয়া এখনও আমার অনুগতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে তাহার ও আমার আশ্রয় লওয়া বা আশ্রয় দেওয়া, উভয়েরই দোষ। কিন্তু কি করিব? তখনও বাল্যের খেয়াল যায় নাই, তাহার আব্‌দার রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তখন দোষ বা গুণ বল, এক করিতে আর করিয়াছি, আর করিতে এক করিয়াছি, কি করিতে কি করিয়াছি! ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি তখনও হয় নাই, তাই বাধ্য হইয়াই

স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইয়াছিল। তখন আর আত্মরক্ষার উপায় ছিল না ; তাই সে কৈশোরের কথাও ছাড়িয়া দিব।

তারপর—যৌবন। এই কালে ইন্দ্রিয়সকল পরিপুষ্টি লাভ করে। জ্ঞানের বিকাশের সহিত দুর্ব্বলতা কমিয়া আইসে। চপলতার স্থানে অনেক সময় গাম্ভীর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে ইন্দ্রিয়সকল আপনাপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী না থাকিয়া, সকলেই আপনভাবে বিভোর হইয়া উচ্ছৃঙ্খল থাকিতে ভালবাসে। স্বাধীনতার বিশাল রাজ্যে সকলেই রাজসিংহাসনের প্রয়াসী হয়। প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে সংগ্রাম চলিতে থাকে, সেই অশ্রান্ত রণে কেহ ক্ষান্ত হয় না। উৎসাহ, উদ্যমকে যেন তাহারা চিরানুচর করিয়া রাখে। যখন যে প্রবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন সে-ই মানবকে চালিত করে। তাহারই বলে 'আমি' যেন 'আমি' থাকিনা, তবে আমিত্বের মধ্যে আমার একটা নিজস্ব কিছু যে না থাকে—তাহা নহে। যেটী থাকে, সেটী চিরস্থির দুর্ম্মোচ্য পাষাণরেখার মত অনন্ত কালের জন্য থাকে। আর এ কথাও সত্য, মানবের ভালমন্দের জ্ঞান বা বিবেক—চিরকালই তাহার সঙ্গী। তবে ভালমন্দ বিচার করিয়া কার্য্য করা অনেকের সামর্থ্যে কুলায় না। যাহাকে বেশ ভাল বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহা সতেজ অথচ দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির প্রবল পীড়নে রক্ষা করিতে পারি নাই। যাহাকে মন্দ বলিয়া ধারণা করিতাম, তাহাকেও তাহাদের ভয়ে দূরে রাখিতে সাহস করি

নাই, বরং নিকটে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বিবেকের বাণী নির্ম্মম হৃদয়ে পদদলিত করিয়াছি। হিতৈষী বন্ধুবান্ধবের কথা কাণে তুলি নাই। অহো! তাই তার পরিণাম এত ভয়ঙ্কর—এত যন্ত্রাদায়ক—এত জ্বালাময়! তখন কে ভাবিয়াছিল যে,' এই প্রকৃতি-সাগর-মন্থনে আমার ভাগ্যে হলাহল উঠিবে! স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই যে, আমার আত্মীয় —আমারই অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, আমারই সর্ব্বনাশ সাধন করিবে! দুধ কলা খাওয়াইয়া কালসর্প গৃহে পুষিয়াছিলাম, কে না বলিবে তাহার কার্য্য সে করিয়াছে, কিন্তু তখনও তা ভাবিতে পারি নাই; তখন আত্মহারা হইয়াছিলাম। ভ্রমেও ভাবিয়াছিলাম না যে—এই সংসারে কেহ সৎ নাই, সাধুকথা—কবির কাব্যময়ী কল্পনা-প্রসূত কবিতা মাত্র। সব সন্তানগ্রাসী রাক্ষস, মায়া মমতাশূন্য নৃশংস দস্যু; তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই। জানি না—তাহাদের স্রষ্টা কে?

কিন্তু অনেক দিনের কথা হইলে হইবে কি? তাহারা আমার কাছে চিরনূতন, সদ্যজাত বলিয়া অনুভূত হয়। সে প্রাচীন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য এখনও ম্লান হয় নাই, সে প্রস্তর খোদিত প্রাচীন রেখা সহজে কি বিলুপ্ত হয়? কত জন্ম জন্মান্তরেও যে তাহা দেখিব—ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিতেছে, তাহার কম্পন নাই, স্পন্দন নাই, কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই;—অবিকৃত, অচঞ্চল, স্থির, ধীর, চিরসৌম্য, কালিদাসের নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপের উপমার ন্যায় এখনও তাহা আমার হৃদয়-শ্মশানে

উজ্জ্বলভাবে ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিতেছে! সে কি ভুলিবার কথা? না—সে মুহূর্ত্তের মোহন চিত্র হৃদয় হইতে কখন যাইবে? সে এই জীবনে ফুরাইবে না; সে গত হইবার নহে; সংসারে সে মুহূর্ত্তের সমাধি নাই, শেষ নাই, সমাপ্তি নাই,; তাহা অনাদি, অনন্ত, অব্যয়। সর্ব্বধ্বংসী কাল সে মুহূর্ত্তের কিছুই করিতে পারে না। সে মুহূর্ত্ত আমার জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, সুখের আস্পদ, শান্তির আলয়। জীবনে সকল ভুলিতে পারি—সুখৈশ্বর্য্য—আশাভয় সকলই বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবাইতে পারি, কিন্তু ভুলিতে পারিবনা—সেই মুহূর্ত্তের মোহিনী স্মৃতি! উহাই আমার শোকে শান্তি—ব্যথায় সান্ত্বনা—জীবনের সম্বল।

কাঁদিতে কাঁদিতে কি করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন খোঁজই রাখি নাই—ভাবিতে ভাবিতে সংসার অন্ধকারময় দেখিয়াছি, চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ক্ষত হইয়াছে, কত ক্লেদ, কত শোণিত তাহা হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে!—তাহাতে কত লোক হাসিয়াছে, কত লোক কাঁদিয়াছে. জগতের লোকের যা'র যা ধর্ম্ম, তা'রা তাই করিয়াছে। তবু ছাই মৃত্যু হইল না—হইবে কেন? তাহা হইলে ত্রিতাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে কে?

যৌবনের আবেগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। প্রকৃত বন্ধু-বান্ধবেরা জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় আমার চক্ষুরুন্মীলন করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি তখন চাহিব কেন?

তাঁহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে হতাদর করিয়াছিলাম। উদ্দাম যুবকেরা যাহা করিয়া উৎসন্ন গিয়া থাকে, আমিও শনৈঃ শনৈঃ আমার সহযাত্রী সুহৃদ্‌দিগের প্রদর্শিত পথে চলিতে লাগিলাম। দিবরাত্রি হর্‌রা, দিবারাতি আমোদ প্রমোদ, দিবারাত্রি স্ফূর্ত্তি চলিতে লাগিল। পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, সব খোয়াইলাম, কাহাকেও অধিক দিন তাহার ক্রিয়া দেখিতে দিলাম না। কয়জনে জুটিয়াপুটিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সব নিঃশেষ করিয়া দিলাম। তখন আমার নিকট অগ্রসর হয় কে? প্রীতির মন্দাকিনী স্নেহময়ী জননী তবুও ছুটিয়া আসিতেন, জীবন-সঙ্গিনী পত্নী তবুও পদে মাথা লুটাইত, কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" মূর্ত্তিমতী স্নেহরূপিনী জননীকে "আমি বুঝি না? তুমি আমাকে বুঝাইবে"? ইত্যাদি বলিয়া রোষকষায়িত রক্তিম নেত্রে সরাইয়া দিতাম। পতিগতপ্রাণা প্রেম-ভিখারিণীকে—অহো আবার কেন সে পুরাতন স্মৃতি আসিল! হায়, হায়! সে কথা এখনও মনে পড়িলে চক্ষু ফাটিয়া রক্ত ঝরে! না, না, বলিব না, কি করিয়াছি বলিব না। না, না বলিব—না বলিলে বুঝি প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। হায়! আমি পিশাচ! তখন সেই অৰ্দ্ধাঙ্গভাগিনী হিতৈষিণী প্রিয়বাদিনীকে "পরের মেয়ে" বলিয়া কত না লাঞ্ছিত করিয়াছি, কিন্তু সে দিনেও সে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িয়াছে! অনাদর, উপেক্ষা, নির্য্যাতন কিছুতেই ত তাহাকে দূর করিতে পারে নাই।

ক্রমে আমার স্ফূর্ত্তির মাত্রা আরও বাড়িতে লাগিল। স্থাবর সম্পত্তি গত হইলে অস্থাবরের উপর দৃষ্টি পড়িল। যে শনির দৃষ্টিতে শ্রীবৎস রাজার রাজ্যনাশ ঘটিয়াছিল, তিনি শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, স্বয়ং জগজ্জননী জগদম্বার পুত্র গণেশের মস্তক শূন্য হইয়াছিল, তখন আমিত কোন্ ছার নগণ্য কীট! তাহার রোষকষায়িত দৃষ্টি হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে? সব গেল, এমন কি পত্নীর সাধের পরিহিত যত্ন-রক্ষিত অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত স্ফূর্ত্তিদেবীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আমার মানসপূজা সম্পূর্ণ করিলাম। কিন্তু দেবীর প্রসন্নতা কোথায়? তবু তাহার "দেহি দেহি" রব! আত্মপ্রাণ সঁপিলাম। কিন্তু কৈ? দেবীর আকাঙ্ক্ষা ত মিটাইতে পারিলাম না। তখন ভাবিলাম, আমার পূজোপচারের বা কোন ত্রুটী হইয়াছে। আবার প্রাণপণে সে রাতুল-চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাহার তুষ্টির জন্য ব্যগ্র হইলাম। জগৎ একপক্ষ হইল, কিন্তু আমি তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলাম। আমার সেই বীরমূর্ত্তি দেখিয়া তৎকালে কে না ভীত হইয়াছিল? কে না ভাবিয়াছিল—আমার অচিন্তিত-পূর্ব্ব প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি আজ কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে আবির্ভূত হইয়াছে? বিশ্ব ত চমকিত হইবেই, কেননা আমিও তখন আমাকে যে বিশেষ বুঝিতে দেই নাই। পাঠক! আপনি কি স্তম্ভিত হইতেছেন না? আপনি কি আমারই মত বিশ্বনাট্যশালায় বিলাসাবতার কামমূর্ত্তির বিকটাভিনয় কখন দর্শন করেন নাই?

আমার মত উদ্দাম যুবকের উল্লম্ফন কখনও কি আপনার দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই? দেখেন না কি—কত সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর আমারই মত ক্ষণিক স্বার্থের প্রলোভে প্রলুব্ধ হইয়া আমারই মত হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন! দেখেন না কি—শুভ্র-কুসুম-স্তবক-নিভ কমনীয় শয্যাশায়ী, নিত্য-সুখ-পরিমল-সেবী বহু মূল্য রত্নালঙ্কারালঙ্কৃত কত সম্ভ্রান্ত যুবক ঐ রসের রসিক হইয়া আমারই মত আজ পথের ভিখারী সাজিয়াছেন? দেখেন না কি—আমারই মত বিলাসহৃতসর্ব্বস্ব উদ্‌ভ্রান্ত যুবক সেই ভালবাসা প্রীতিময়ীর প্রেমকুহকে তার সাধের প্রমোদবাসরে সারানিশি জাগিয়া আজ কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষে বর্ষার বারিধারার ন্যায় অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জনে দিন কাটাইতেছেন! দেখেন না কি—কাল যে অমৃতেও অরুচি আনিয়াছিল, ঘৃত-সর-নবনীতে হুঙ্কার করিয়াছিল, দেব-ভোগ্য সামগ্রীকে কুক্কুরের খাদ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, আজ সে আমারই মত তণ্ডুলকণার প্রয়াসী হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছে! কাল যাহাকে দেবপ্রতিম পূজ্যাস্পদ ভাবিয়া বিশ্বের লোকে তাহার পাদদেশে নতজানু ও যোড়কর হইয়া দণ্ডায়মান ছিল, আজ সে ভিক্ষাঝুলিস্কন্ধে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ভুলিয়াও তাহার প্রতি কেহ দৃক্‌পাত করিতেছে না। ও হরি! ইহারই কি এই পরিণাম? মানুষ ইহারই অহঙ্কার করে!

স্বার্থপর মানব! সংসারে তোমার অসাধ্য কার্য্য কি? তুমি স্বার্থের মোহে আপনাকে কীট করিয়া পরপাদুকা বহন

করিতেছ, কিন্তু তোমার অন্তরে বিশ্ব-ব্যাপিনী-রাক্ষসী-আশা বিশ্বগ্রাসিনী যুবতী মূর্ত্তিতে উলঙ্গিনী। তুমি নিজ স্বার্থে পয়োমুখ বিষকুম্ভের সদৃশ স্তাবকতা-মন্ত্র অহর্নিশ উচ্চারণ করিতেছ, তোমাকে আর কি বলিব? সংসারের কোনও অভিধানে তোমার যোগ্য বিশেষণ খুঁজিয়া পাই না। তোমার বিষয় যতই বলি না কেন, তবু যেন কিছু বাকি থাকিয়া যায়। তুমি একটা অনাচার, আবর্জ্জনা, যন্ত্রণা, দুঃখ ও ব্যাধি।

বল দেখি ভাই! মনুষ্য-জন্ম কিসের জন্য? মনুষ্যটা কোন্ জানোয়ার? মনুষ্যে আর পশুতে, মনুষ্যে আর পতঙ্গে, মনুষ্যে আর কীটে স্বতন্ত্রতা কি? দেখি—বানরের মানুষেরই মত সব; তবে তাহাদের ক্রিয়া ও কর্ম্ম মনুষ্য হইতে পৃথক্। আবার দেখি—বানরে যত মহত্ত্ব—যত শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যে তাহার শতাংশেরও কণিকা নাই। তুলনায় সমালোচনা করিলে তখন রহস্যোদ্ভেদ হয়। তবু তুমি—আমি মানুষ এবং মানুষ বলিয়া একটা গৌরবের মুকুট তবু আমরা চিরদিনই বহন করিয়া আসিতেছি। বেশ বাপু! তুমিই শ্রেষ্ঠ হইলে, তুমিই দেবতা হইলে, তাহাতে সে অধমদিগের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি হইল? তোমার অহঙ্কারে তুমিই রসাতলে গমন করিলে। অহঙ্কারে অর্থ-বুদ্ধি নাশ, আত্মার অধোগতি, ইহলোকে দুর্নাম, পরলোকে দুষ্কৃতিনিবন্ধন নিরয়নিবাস ঘটে। হে মানব! তুমি যে স্বার্থপর, আপনারটা ভাল বোঝ? তাহা হইলে এ কিরূপ করিলে? কল্পতরু ভ্রমে বিষতরুর আশ্রয় গ্রহণ

করিলে? হা নির্ব্বোধ! তুমি আপন বাগুরায় আপনি বদ্ধ হইয়া যাইলে? আপন কার্য্যে অনর্থ বাধাইলে? তবে না কি তুমি বুদ্ধিমান্!. এই বুদ্ধিতেই ত্রিসংসারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে চাও? ধিক্ তোমায়! ধিক্ তোমার অহঙ্কারে! ধিক্ তোমার প্রাধান্যে! ধিক্ তোমার মনুষ্য-জন্মধারণে!

হায়! কোথায় আসিয়া পড়িলাম? প্রাণের আবেগে কি বলিতে কি বলিতেছি? বলিতেছিলাম—সেই পূর্ব্ব স্মৃতির কথা! আবার সেই—সেই পূর্ব্ব স্মৃতির কথা! আবার সেই—সেই দিনের কথা! যে দিন আমার হৃদয়বীণায় নূতন ঝঙ্কার উঠিয়াছিল, যে দিন আমার আশার গৃহে নূতন আলোক আসিয়া আলোকিত করিয়াছিল, সেইদিনের—এ জীবনের সেই ব্রাহ্মমূহূর্ত্তের কথা। জীবনের দু' একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা কার না স্মৃতিতে জাগরূক্ থাকে? বাল্যে পিতামহীর মুখে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা শুনিয়াছিলাম। তৎকালীন অনশনক্লিষ্ট, জীর্ণ, শীর্ণ, আতুর, বুভুক্ষু, দরিদ্রের কথা তিনি বেশ গুছাইয়া বলিয়া আমাদের বাল্য চক্ষুতে অশ্রু আনয়ন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"যে ছিয়াত্তরের কথা বলিতেছ, তখন তোমার বয়স কত?" বৃদ্ধা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"তখন আমার বয়স আট কি নয় আন্দাজ ভাই!" তাই এখন ভাবি, বৃদ্ধার সেই বাল্য-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়-রাজ্যে নবতি বৎসর ব্যাপিয়া সমভাবে আসন বিস্তারপূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছিল। সেই তুলনায় আমার সেই

পঞ্জরভেদী মর্ম্মান্তিক কাহিনী কয়দিনের? চিত্তাকর্ষক ঘটনাগুলি মানবহৃদয়ে একটা চিরস্থায়ী রেখা রাখিয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, সে দিনের ঘটনাও আমার হৃদয়ে একটা চিরস্থির চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কালে তাঁহা ম্লান করিতে পারিবে না।

বিধির বিড়ম্বনায় সব খোয়াইলাম! স্নেহ-প্রবণা বৃদ্ধা জননী এই হতভাগ্যের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া, জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া একদিন নশ্বরধাম ত্যাগ করিলেন! সকল চিন্তা, সকল যন্ত্রণার হাত এড়াইলেন! তাঁহার দগ্ধ হৃদয় শীতল হইল। নয়নের অশ্রু চিরদিনের নিমিত্ত শুকাইল। নিদাঘ-তপ্ত মন্দার কুসুমে কি যেন অনৈসর্গিক শিশির সম্পাত হইল। স্বর্গপ্রধানা জননী—যে মা আমার স্মিতাননা, সদা হাস্য-প্রফুল্লময়ী, চির-আদরিণী, স্নেহময়ী, গুণময়ী, সে মা আমার নিমেষের মধ্যে চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন! আর পাইব না—একদিন বা এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাগতপ্রাণা জননীকে আর এ জীবনে দেখিতে পাইব না!

মা! মা! কোথায় তুমি? মহাদেবি! বরাভয়করা, আনন্দময়ি! সর্ব্বার্থ-দায়িনি! কোথায় মা? এ সংসার যন্ত্রণার আধার জানিয়া কি শান্তিময়ি! কোন শান্তিময় পবিত্র নির্জ্জন স্থানে লুকাইলে? সত্য সত্যই কি জননি! তোমার অনিন্দ্য নিরুপমা হিরন্ময়ী মূর্ত্তি এ জীবনে আর সন্দর্শন করিতে পাইব না? কে বলিল? মা কি নিষ্ঠুরারে! দয়াময়ী

মা ঐ যে! আমার শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায়, আমার চক্ষুর প্রতি পলকে পলকে, চারিপার্শ্বে বেষ্টিতা—পদ্মাসনা মা আমার ঐ যে! ধ্যানময়ী—শান্তিময়ী—জ্যোতির্ম্ময়ী মা আমার ঐ যে! আজ মার মুখে এত হাসি কেন? মাগো! জীবনে কখনও তোমাকে হাসাইতে পারি নাই! কত কষ্ট দিয়াছি! মা! তবু ত তোমার আশীর্ব্বাদ লাভে কখনও বঞ্চিত হই নাই! যে দুর্ভাগ্য নির্ম্মম এ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমায় ক্ষণিকের জন্যও সুখী করিতে চেষ্টা করে নাই, একবারও তোমার অযাচিত করুণা-কল্প-লতিকার শীতল ছায়ায় বসিয়া দুর্নিবার সংসার-জ্বালার বিষয় চিন্তা করে নাই, সে পাপিষ্ঠ, সে দস্যু, সে দুর্ব্বৃত্তকেও তোমার এত দয়া!

আ মরি মরি মাতৃ-স্নেহ! এই সংসার-বৈতরণীর উত্তপ্ত সৈকতে মন্দাকিনীর অমিয়-লহরী! ইহা ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে সমুদ্ভূত। ইহা স্বর্গেরই প্রবাহ বহিয়া লইয়া আসিতেছে—ইহাতে আবিলতার লেশ মাত্র নাই। পার্থিব কোন মলিনতাই উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা এই মরজগতে মানুষকে অমরত্ব প্রদান করে। এমন শান্তিকর, সুখদ, প্রাণারাম, পীযূষ ধারায় যে বঞ্চিত হইয়াছে, বা যে হতভাগ্য উহাকে আমার মত হেলায় হারাইয়াছে, তাহার মত দুর্ভাগ্য এ জগতে আর কে?

এ জীবনে মা! তোমার পূজা করি নাই। দেবি! তখন তোমায় চিনিতে পারি নাই। মদিরা-মত্ত হইয়া, উদ্দাম

প্রবৃত্তির প্রবল তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া কোথা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছি। এখন তুমি মা কোথায়? জীবনের পর পারে যাইয়া—তোমার সাক্ষাৎ পাইব কি? একবার তোমায় প্রাণ ভরিয়া পূজা করিবার ভাগ্য ঘটিবে কি? থাক্ সে কথা, দয়াময়ি! এত দয়া তুমি কোথায় পাইলে মা! পুত্র-সম্ভবা হইলে যিনি মাতার বক্ষে সুধা নিহিত করিয়া দেন, সেই দয়াময়ের করুণায় কি মা তোমার হৃদয়ে এত দয়া? যাহাতে দয়া হইতে পারে না, সে কার্য্যে দয়া ত দূরের কথা বরং ক্রোধ আসিতে পারে, তেমন কত অত্যাচার, কত উপদ্রব, কত বিদ্রোহ করিয়াছি, এখন সে কথা বলিতে লজ্জা বোধ করে, হৃদয়ে গ্লানি উপস্থিত হয়, প্রাণে ব্যথা আসে, মনে অব্যক্ত অরুন্তুদ জ্বালা উপস্থিত হয়, সেই সব করিয়াছি। হায়! তবুত মায়ের দয়া সমভাবে পাইয়াছি। ঐ যে, তরতর বেগে কল কল নাদে—মায়ের বুকভরা করুণা-প্রবাহিণী! উহা কি শুধু আজই বহিতেছে? তাহা নহে। অনন্ত কাল হইতে বহিতেছে। বিশ্বের আদি হইতে বহিতেছে। সে প্রবাহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ভাসিয়াছিলেন জমদগ্নি, পরশুরাম, রাম, লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, বুদ্ধ, মহম্মদ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, নানক, রাজা, প্রজা সকলেই ভাসিয়াছিলেন। সে প্রবাহে যিনি ভাসেন না বা ভাসিতে পান না, তাঁহার জীবন অপূর্ণ; তিনি—তিনি হইতে পারেন না, কি হইতেন, তাহা ভাষায় বলিতে পরি না, জ্ঞান-বুদ্ধিতে যোগায় না, দর্শন তত্ত্বেও

খুঁজিয়া পাই না। তাই বলি, মায়ের করুণা-মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য, মাতৃ-স্নেহ আস্বাদন করিবার জন্য ভগবান মাঝে মাঝে অবনীতলে অবতীর্ণ হন এবং নিজ মুখে "মা মা" বলিয়া মায়ের পীযূষ পান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন। ধন্য মা তুমি! তখন ত মা বুঝি নাই—তুমি নিরাকারা চৈতন্যরূপিণী—সন্তানকে পালন করিতে সাকার-মাতৃ-মূর্ত্তিতে ধরায় আসিয়া উদয় হইয়াছ! তখন তবে কেন একটু আভাস দিলে না মা? সে আবর্ত্তময় নরকে পতিত সন্তানকে উদ্ধার করিবার জন্য একবার হাত বাড়াইয়া সঙ্কেতে আত্ম-পরিচয় প্রদান না করিলে কেন মা?

হায়! ভাগ্য দোষে—কর্ম্মফলে মা তোমায় চিনিতে পারিলাম না! হতাদরে অনাদরে ঠেলিলাম। হায় আমার দশা কি হইবে?

মা চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দিন পরেই পরিণীতা সহধর্ম্মিণী বিষম যক্ষ্মায় আক্রান্তা হইল। সেই ক্ষীণাঙ্গী পূর্ব্ব হইতেই ক্ষীণা হইতেছিল, সেই নির্ম্মল জ্যোৎস্না বহুদিন হইতেই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, প্রমোদ-ফুল্ল শুভ্র-যূথিকা—সংসারোদ্যানের স্বর্ণলতিকা অনেক দিন হইতেই আমার অত্যাচারে শুকাইয়া যাইতেছিল। এত দিন পরে, আমার উপর রাগ করিয়া—আমার উপর অভিমান করিয়া—মর্ত্ত্যের লীলা—মাটীর খেলা সাঙ্গ করিয়া প্রকৃতির রমণীয় পবিত্র ক্ষেত্রে চলিয়া গেল। সে আর আসিবে না, তাহার

সেই মুখের সেই ভাষা আর শুনিব না, আর সে আমার পানে সজল-সরল-করুণ দৃষ্টিতে চাহিবে না! সান্ধ্য গগনের ধ্রুবতারা—বিশাল-সংসার-সরসী বক্ষে সোণার তরণী—উদারতার জীবন্ত প্রতিমা—চির আনন্দময়ী—সহধর্ম্মিণী আমায় চিরদিনের জন্য চক্ষের অন্তরালে চলিয়া যাইল!

সে এতদিন পরে সব জ্বালা এড়াইল। না, না, জ্বালা এড়াইলে যে আর জন্ম হয় না,—ইহা পরম দার্শনিক মহর্ষি গৌতমের উক্তি। ঋষি বাক্য ত মিথ্যা হইবার নহে। সে জন্মিবে—সে আবার আমার হইবে—আবার আমায় ভাল ভাবে লাভ করিবে, কারণ ইহা যে অভাগিনীর ঐকান্তিকী বাসনা ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে এই কামনা লইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শ্রীভগবান শ্রীমুখ হইতে ত আপনি বলিয়াছেন,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

গীতা ৮ অঃ ৬ শ্লোকঃ।

অর্থাৎ কৌন্তেয়! যিনি যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন, তিনি সর্ব্বদা তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই সেই তত্ত্বকেই লাভ করিয়া থাকেন। আবার 'বীতরাগ জন্মদর্শনাৎ' রাগ অর্থাৎ কামনা না থাকিলে জন্ম হয় না; তখন তাহার ত তা নষ্ট হয় নাই—সে সরলতাময়ী কামনার পাশ ত ছেদন করিতে পারে নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, এতদিনের

পর সে সব জ্বালা এড়াইল? যে জ্বালা—যে যন্ত্রণা—যে ক্লেশ আমি তাহাকে দিয়াছি, সে কি যাইবার?—না ভুলাইবার? সে আমার—তবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া—আমাতে প্রাণভরা ভালবাসা ঢালিয়া—আমার জ্বালা লইয়া আবার এ পোড়া ধরণীতে জন্ম গ্রহণ করিবে। দিন কতকের জন্য আমার চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে মাত্র—স্বধু দু দিনের ব্যবধান।

প্রিয়তমা লক্ষ্মী হারাইয়া আরও শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্ব্ব হইতেই অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, উত্তমর্ণগণ অগ্র হইতেই বাস্তু ভিটার স্বত্ব পর্য্যন্ত লইয়াছিল, স্থাবর সম্পত্তি দূরে থাক্, তৈজস পত্রাদি এমন কোন অস্থাবর সম্পত্তি ছিল না, যাহা বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ ধন দ্বারা এক বেলা চলিতে পারিত। জানি না, কত দিন আমাকে এই স্মৃতি বহন করিতে হইবে।

প্রেমময়ীকে চিরতরে চিতায় বিসর্জ্জন দিয়া ভগ্ন মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিলাম। হরি হরি! গৃহ কোথায়? তখন গৃহ যে আমার উত্তমর্ণ-কবলে কবলিত হইয়াছে! যাই কোথা? গৃহ হইতে বাহির হইলাম। দয়াময় তখন দয়া করিয়া আমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিলেন। সীমাবদ্ধ গৃহ আর আমার গৃহ রহিল না, সীমাহীন অনন্ত আকাশ আমার গৃহের আচ্ছাদন হইল, সমগ্র ধরণী আমার গৃহভিত্তি হইল। সে দিন—সেই দিন—বন্ধনবিমোচনের সেই সুখের দিন আমার জীবনের আর এক ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত! মরুভূমিতে

মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবমান পান্থের প্রকৃত সলিল দর্শনের ন্যায় আমার জীবনে যে কয়েকটী শুভ মুহূর্ত,—ব্রাহ্মমুহূর্ত আসিয়াছে, তাহার কথা কি ভুলিতে পারি? তাহাই যে এখন আমার জীবনের সম্বল।

পত্নীহারা হইয়া পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে—কান্ত কবি রজনীকান্তের "আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ গর্ব্ব করিতে চুর," এই কবিতা ছত্রের অর্থ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। হায়, অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষে ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়া কত না অত্যাচার করিয়াছিলাম! তখন "অহং" এর অর্থ বুঝি নাই, "আমি" কে বুঝিতে পারি নাই, আপাত রম্য ক্ষণিক সুখকে চির শান্তির আলয় ভাবিয়া প্রকৃত সুখের রসাস্বাদন করিতে পারি নাই! যে দিন সে শাশ্বত সুখের সন্ধান পাইলাম, সে দিন কি আমার জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ নয়?

যখন আমার ভাবনায় আমা কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা জননী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বর্গারোহণ করিলেন, ভূস্বর্গের দেবতা—স্বর্গগত স্নেহময় জনক—না—সে কথা কিছুই বলিব না! যখন প্রাণাধিকা ভার্য্যা আমার, যক্ষ্মাক্রান্তা হইয়া অপরিচিত পথের যাত্রী হইবার উদ্‌যোগ করিতেছিল, যখন আমার দু'টী চক্ষের উপর তাহার সেই সহাস-মধুর-ক্ষীণ দৃষ্টি, আপনার হইতেও আপনার ভাবিতে ভাবিতে মুক্তিক্ষেত্রে মহাযাত্রা করিয়াছিল, যখন নিত্য-ক্ষীর-সর-নবনীত-ভোজী সহস্র সহস্রাধিপতি বিলাসের কোলে লালিত দুর্ভাগ্য আমি, এক মুষ্টি অন্নের জন্য

লালায়িত হইয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্ত আমার জীবনের কি স্মরণীয় মুহূর্ত্ত নয়? ইহা কি যাইবার?—না ফুরাইবার? আমার জীবনে চন্দ্র-সূর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, ব্রহ্মাণ্ড চলিয়া যাইতে পারে, কালের অবিরাম গতি ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু সে মুহূর্ত্ত অন্ত হইবার নয়, সেই মুহূর্ত্ত আমার চির স্মরণীয়। রামরাবণের যুদ্ধের ন্যায়, ট্রয়নগরী ধ্বংসের ন্যায়, কলাম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ন্যায়, পদ্মিনীর সতীত্বের ন্যায়, কালিদাসের শকুন্তলার ন্যায়, ম্যাকবেথের ন্যায়, আমাদের শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ন্যায়, জানকীর অগ্নি পরীক্ষার ন্যায়, পরশুরামের মাতৃহত্যার ন্যায়—কয়টা উপমা দিব? যাহা হউক, এই জীবনের তিনটা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের কথা বলিয়াছি, আবার একটী বলিব। সেটী অচিন্তিত পূর্ব্ব। বৈয়াকরণগণ একটীর অপেক্ষা অন্যটীর শ্রেষ্ঠ হইলে "তর" ও অনেকের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ হইলে "তম" ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেইরূপ আমার জীবনে অনেকগুলি ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, ব্রহ্মক্ষণ আসিলেও এটী মধুর—প্রাণমোহকর—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ততম।

ইহলোকে যখন আমার বলিতে আর কেহ রহিল না, একে একে সব চলিয়া গেল; তখন উদরান্নের জন্য দাসত্ব করিতে গ্রামের বাহির হইলাম, কিন্তু যাই কোথায়? লজ্জায়, অভিমানে পৃথিবীর লোকের প্রতি ক্ষণেকের জন্যও চাহিতে পারিতেছিলাম না। শীর্ণদেহে, জীর্ণবাসে, মলিন বদনে ক্ষুণ্ণ মনে যাই কোথা? কে আমায় আশ্রয় দিবে? আমার

আশ্রয়দাতা ত্রিসংসারে কে আছে? কাহাকে বলিব? যাহাকে বলিব—সে আমার পূর্ব্বাবস্থার কথা মনে করিয়া—কি ভাবিবে? যাহা ভাবে ভাবুক, কিন্তু আমি কি বলিয়া আশ্রয় লইতে যাইব? কি বলিয়া আশ্রয় লইতে হয়, তাহা ত জানি না। এইরূপ চিন্তা-তরঙ্গ হৃদয়-সমুদ্রকে বিশেষ আন্দোলিত করিয়াছিল। কিন্তু অভাব বড়ই শিক্ষাগুরু। অভাবে অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি জন্মে, অভাব জীবকে সতেজ করে, অভাব লোককে অন্ধকার হইতে দিব্যালোকে লইয়া যায়, অভাব কাহাকেও গুরু ধরে না, সে নিজেই শিক্ষাগুরু। যখন ভারতে ধর্ম্মের অভাব ঘটিয়াছিল, তখন চৈতন্য, শঙ্কর প্রভৃতি ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যখন মনুষ্যের অর্থের অভাব ঘটিয়া থাকে, তখন সে দস্যুবৃত্তি করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। যে সময়ে রোম সমস্ত ভূমণ্ডলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তখন রোমসম্রাট্ ক্লডিয়াস ব্রিটন জয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, সে চেষ্টার ফলে দক্ষিণ ওয়েল্‌সের রাজা কারাক্‌টাস্ পরাভূত হইয়া বন্দীভাবে রোমে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কারাক্‌টাস্ তথায় যাইয়া দেখিলেন, সভ্যতাসম্ভূত শান্তি রোমের সর্ব্বত্রই বিরাজমান। সুরম্য হর্ম্ম্যমালা-শোভিত নগরী যেন বাস্তবিকই জগতের কীর্ত্তি-ধ্বজারূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাই তিনি তখন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, রোমে এত সমৃদ্ধি থাকিতেও রোমানেরা কি জন্য পর্ণকুটীরবাসী ব্রিটনদিগের দেশ অধিকার করিতে

লালায়িত ? অভাব না হইলে ত লোক পরদ্রব্যে লোভ করে না। তাই বলিতেছি, অভাবে সকলকে সকলই করিতে হয়।

আমিও তাই করিলাম। কেমন করিয়া যাচ্ঞা করিতে হয়, কেমন করিয়া নতমুখে জোড় করে লোকের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, অভাবে সবই শিখিয়া লইলাম। কিন্তু সহানুভূতি পাইলাম কৈ ? হায় ! সংসারে দয়া যে দুর্লভ পদার্থ। সকলের নিকট দয়ায় বঞ্চিত হইলাম। দৈন্য-দারিদ্র্যে, আপদ-বিপদে—বুকের রক্তে—চোখের জলে একদিন যাহাদের সহানুভূতির মহাপূজা করিয়াছিলাম, তাহারা —সে সব স্বার্থের দাস, বসন্তের কোকিল, মিষ্ট কথার বণিক্, সম্পদের পোষ্যপুত্র, আমাকে দেখিয়া দূরে সরিয়া গেল, কাছে আসিল না। কাছে আসিল না,—তার অর্থ—যদি আমি কিছু চাই।

পরিশেষে ভিক্ষা। প্রবাদে বলে "ভিক্ষায় কি দুঃখ ঘোচে ?" দুঃখ ঘুচুক আর নাই ঘুচুক, পেটের চিন্তা ত যায়। তাই বা যায় কোথায় ? অভিশপ্ত নরাধমের তাও জুটিল না। প্রবল জ্বরে পড়িলাম। তখন গ্রামের উপকণ্ঠে —বৃক্ষতলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে আসিয়াছিলাম। লোকসহবাস তখন যেন আমার বিষের মত লাগিতে লাগিল। যে ধরণী এক সময় আমার চক্ষে বাসন্তী-বনলক্ষ্মী কিম্বা বিবাহিতা কন্যার সাজে সজ্জিতা ছিল, সেই ধরণী—সেই ধরণীই তখন

এই নয়নে—একটী অকালবিধবা অবলা বালার অন্তর্দাহী মলিনা মূর্ত্তিতে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পৃথিবীটা যেন ভীষ্মের শরশয্যা বোধ হইল। পাণ্ডুরোগীর নয়নে জগতের যাবতীয় বস্তুই হরিদ্রা বর্ণ দেখায়।

ভাবিলাম, ভগবতী বসুন্ধরা দীর্ণ হয় না কেন? আকাশের বজ্র হেথায় হোথায় পতিত হয় কেন? আমার মাথার উপর পতিত হইতে কি সে ভয় পায়? হুতাশন এর ওর গৃহ দাহ করিতে পারে, সর্ব্বভুক্ সকল গ্রাস করিতে পারে, আমার এই দেহটা কি সে পোড়াইতে পারে না? কেন পারিবে না? করিবে না। সে যে পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীর লোক হইয়া গিয়াছে! এইরূপ নানা চিন্তায় শরীর বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপরে প্রবল জ্বর। দুই দিন কিরূপে কাটিল, অন্তর্যামীই জানেন। আমার সংজ্ঞা ছিল না। তৃতীয় দিনে একবার যেন মনে হইয়াছিল—ক্ষণেকের তরে সংজ্ঞা আসিয়াছিল। তখন আমার প্রবল তৃষ্ণা পাইয়াছিল, কিন্তু নিকটে কে আছে যে, সে তৃষ্ণায় জল প্রদান করিবে? তৃষ্ণায় যেন প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল! কাহাকে ডাকিব? অনাথের নাথকে মনে মনে ডাকিলাম। সংজ্ঞা হারাইয়া ভগবানের কৃপায় যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা পাইলাম।

কয়দিন যে এ ভাবে গেল কে বলিবে? ঠিক বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু শেষ দিন অতি ভয়ঙ্কর! ঘোর

নিদ্রাবস্থার স্বপ্নের ন্যায় মনে হইয়াছিল, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, বাক্‌শক্তি নাই যে, চীৎকার করিব। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে ছিলাম। কিন্তু দুর্ব্বলতা এত যে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শক্তি ছিল না। বুঝিতে পারিতেছিলাম, যেন চক্ষের কোণে দুই এক বিন্দু অশ্রু জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে, তাহাদের গণ্ড বহিয়া পড়িবারও সামর্থ্য নাই! আমি "ত্রাহি, ত্রাহি" শব্দে ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া ছিলাম। তখন দুর্ব্বলের বল—দীন হীন কাঙ্গালের রক্ষাকর্ত্তা—দয়ার সাগর ভিন্ন এ অনাথের সম্বল আর কেহই ছিল না! মনে মনে বলিতেছিলাম, "দীন-বন্ধু, পরিত্রাণ কর, আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

তখন বুঝিলাম—সেই অনাথনাথের নাম স্মরণে আমার সেই অব্যক্ত, অসহ্য যন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে অনেক পরিমাণে লঘু হইয়া আসিতে লাগিল। তেমন যে দারুণ তৃষ্ণা—যে তৃষ্ণায় ছট্ ফট্ করিতেছিলাম, প্রাণ-বায়ু নির্গত হইবার যেন তিলার্দ্ধও অপেক্ষা করিতে পারিতেছিল না, সে পিপাসা যেন কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া আসিল। যাতনারও কথঞ্চিৎ উপশম হইতে লাগিল, একটু শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম! দেখিলাম—আমার শয্যার পার্শ্বের শিয়রে কে যেন সৌম্যমূর্ত্তি, ধীর, স্থির, এক অতি বৃদ্ধ আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন! তাঁহার শুভাগমনে সে স্থান সচন্দন বেল মল্লিকা-চম্পকের গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে! বৃদ্ধ অতি স্নেহপ্রবণ,

প্রসন্ন বদন, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় গৌরবরণ, প্রশান্ত করুণার্দ্র নয়ন, অবিলাসী, ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিজয় ভূষণে বিভূষিত, আজানুলম্বিত বাহুযুগল। দক্ষিণ হস্ত আমার মস্তকের উপর রাখিয়া বামহস্তে আমার সর্ব্বগাত্র বুলাইতে লাগিলেন। অহো! সে মধুময় করস্পর্শসুখ এ জীবনে কি ভুলিবার? জানি না—সে পদ্মহস্তে কি শক্তি নিহিত ছিল? আমার দেহের শিরায় শিরায়—ধমনীতে ধমনীতে তড়িৎ সঞ্চারিত করিয়া দিল বেসুরা হৃদয়তন্ত্রীগুলি কাহার করুণকরস্পর্শে বাজিয়া উঠিল? জ্ঞানাঞ্জন শলাকারও আবশ্যক হইল না। জন্মান্ধ আঁখি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। তখন আমার কর্ণে অমৃতধারাবর্ষিণী ভাষায় বলিতে লাগিলেন "বাছারে! ভয় কি? ত্রিসংসারে তোর কেহ নাই বলিয়া ভাব্‌চিস্? "ন ভেতব্যং" আমি আছি। কাঙ্গালের বন্ধু আমি আছি, আতুরের সহায় আমি আছি, দীনের রক্ষায় আমি আছি। চক্ষুরুন্মীলন কর আমাকে চিনিতে পারিস্ কি না দেখ্।"

চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম, দেখিলাম—যাহা দেখিলাম—তাহা এ জীবনে কখনও দেখি নাই, আর কখন দেখিব কি না বলিতে পারি না। অনেকবার ভাবিয়া দেখিয়াছি, শরীর ও মনের দুর্ব্বলতায় ভ্রান্তি দর্শন করিয়াছি কি না? না, না, যাহা দেখিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। যে যাহা বলে বলুক, আমি জানি সেই জ্যোতির্ম্ময় বৃদ্ধ সত্যসুন্দর, সত্য আনন্দময়।

কে—সে ?

কে—সে ? আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে, মরমের মধ্যস্থলে, প্রাণের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া মোহন বেণু বাজায় কে—সে ? কাহার বেণু রবে আমার মরম-যমুনায় ভাব-লহরী ছুটিতে থাকে ? কাহার বাঁশীর রবে পিপাসাকুল অধীর প্রাণে, চকিত চাতকের ন্যায়, পলক শূন্য ভাবে, উদাস অন্তরে পাগল হইয়া ছুটিতে চাই ? শুভ্র জ্যোৎস্নার মত—সুরভিত কুসুমের মত—শিশুর হাসির মত অনবদ্য সুন্দর কে—সে ? কে—সে পলক-শূন্য হইয়া আমার মত দীনের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে ? ঐ হৃদয়রঞ্জনের দর্শনে হৃদয়ের ব্যথা জুড়াইয়া যায় ! জীবনের অশ্রুধারা, দীর্ঘশ্বাস, অবসাদ কোথায় যেন দূরে চলিয়া যায় ! নৈশান্ধকার হইতেও ঘোর মসিকৃষ্ণময় মানসাকাশে সহসা যেন পূর্ণিমার নির্ম্মল জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠে ! মরা গাঙে ভাদ্রের বন্যা আসিয়া দেখা দেয় ! গৈরিক নিঃস্রাবের মত পাষাণ ভেদ করিয়া শান্তির শীতল ধারা প্রবাহিত হয় ! ভ্রমর গুণ্ গুণ্ করিয়া কুসুম-পরিমল বিতরণ করে ! জানি না —কোকিল কোন্ অব্যক্ত মধুর ভাষায় ডালে বসিয়া আনন্দ-বসন্তের দিনে কুহু কুহু রবে কানন মুখরিত করে ! আমরি মরি ! কি সুন্দর তাহার আবেশ ভরা ঢুলু ঢুলু ভাব। সে ঢুলু ঢুলু ভাবে বিরাট বিশ্ব যেন ঢলিয়া পড়িতেছে।

সে কেন আমায় এত ভালবাসে ? আমার কষ্টে কেন তাহার চাঁদমুখখানি ম্লান হইয়া যায় ? তাহার বদনেন্দু ঘন কাল মেঘে ঢাকিয়া পড়ে ? আমন ধান্যের সুশ্যামলভরাক্ষেত্র কার্ত্তিকের শিশিরে শুষ্ক হয় কেন ? কে—সে ? আবার আমার সুখে তাহার আনন্দ যেন ধরে না, জাহ্নবীর স্রোতের মত দিবা-রাত্রি সে কুলু কুলু করিয়া বহিয়া যায়। সে অব্যক্ত মধুর গীতি যেন আর থামে না। অধরে প্রাণমোহকর মৃদু মধুর হাসি ! সে হাসিতে যেন অমৃত ঝরে, কত ফুলের নির্য্যাস ক্ষরিত হয় ; তখন তাহার হৃদয় নিবাতনিষ্কম্প সুনির্ম্মল স্বচ্ছতোয়—গিরিপাদদেশস্থ প্রভাত কালীন হ্রদের মত বোধ হয়, যেন সেই হাসিরই কণিকা হইতে সুধাবর্ষী চন্দ্রমার উৎপত্তি, সেই হাসির অণুর অণু হইতে পদ্ম, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি কুসুমের জন্ম। কে—সে ? এত দিন ত তাহাকে দেখি নাই ! বোধ হইতেছে, সে আমার আপনার হইতেও আপনার। যে আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, যে আমার হৃদ্‌বিহারী, যে আমার সকল যন্ত্রণায় শান্তি, যাহার মধুর বাঁশীর রব শুনিয়া আমি সতত উৎফুল্ল হই. যে আমার রুগ্নশয্যায় শুশ্রূষাকারী বন্ধু, সুস্থাবস্থায় প্রিয় মিত্র, যাহার আশ্বাস বাক্যে আমি নব-প্রাণ পাইয়াছিলাম, যাহার কৃপাকটাক্ষে আমার জীবন ধন্য হইয়াছিল, যাহার প্রমোদ-প্রফুল্ল-সহাস-বিনোদ ছবি দেখিয়া সকল ভুলিয়াছিলাম, তোমরা কি বলিতে পার—কে—সে ? যাহার মধুর মূরতি দেখিলে জননীর স্নেহ, প্রণয়িনীর প্রেম,

আত্মীয়ের বন্ধন, ধনাগম তৃষ্ণা, যশোলিপ্সা, রূপলালসা, গর্ব্ব-অহঙ্কার, মান-অভিমান, হিংসা-দ্বেষ, ক্ষোভ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা সকলই ভুলিয়া যাইতে হয়, ব্রজমণ্ডলের গোপাঙ্গনাগণের ন্যায় লজ্জা, কুল, শীল, মান ত্যাগ করিয়া শ্যামের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে হয়, সে প্রিয় হইতে প্রিয়তর, প্রিয়তর হইতে প্রিয়তম কে—সে? এত দিন ত তাহাকে দেখি নাই। সে তবে এত দিন কোথায় ছিল? কোন্ নিভৃত স্থানে—কোন্ অজ্ঞাত ভবনে—কোন্ দূর কাননে—কোন্ প্রকৃতির তরঙ্গিণীর মনোরম পুলিনে কোন্ বিলাসীর প্রমোদ কুঞ্জে—তাহার সাধের সম্মোহন বেণু লইয়া সে আপন মনে বাজাইতে ছিল? জানি না, কাহার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সে সেখানে লুক্কায়িত ছিল? বলিতে পার করুণাময়! এই দুঃখময়, জ্বালাময়, পিপাসাময় সংসারমরুর দগ্ধ বক্ষের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কে সে বসিয়াছিল? বলিতে পার—কেমন করিয়া অনাথবন্ধু হইয়া পৃথিবীর অনাথগণকে সে ভুলিয়াছিল?

কে—সে কেমন করিয়া বলিব? কেমন করিয়া বুঝাইব? অন্ধ অপর অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। আমার মত সংসার-মায়াবদ্ধ জীবের আঁখি কেমন করিয়া সেই দয়াময়ের স্বরূপ দেখিবে? আমি স্বয়ং যখন "আমি" কে বুঝিতে পারি না, তখন তোমায় আমি কেমন করিয়া বুঝাইব—কে—সে?

তুমি হয়ত বলিবে "কে—সে" দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও। আমি বলি, তাহার রূপের বা গুণের তুলনা ত' উপমা দিয়া বুঝান যায় না। তাহার উপমা কি ত্রিসংসারে মিলে ? সে যে অতুল্য, পরম হইতেও পরম নিধি। কবি যে স্থানে যাহার উপমা দিতে অসমর্থ হন, সেই স্থানে সেই বস্তুর সহিত সেই বস্তুরই উপমা দিয়া থাকেন। কোন সংস্কৃতজ্ঞ স্বভাব কবি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছেন "রাম রাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।" রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধের মত। বাঙ্গালার খাঁটি কবি নিধুবাবু (রাম নিধি গুপ্ত মহাশয়) প্রণয়িনীর রূপ বর্ণনায় উপমা খুঁজিয়া না পাইয়া শেষে হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে যেমন গঙ্গপূজা গঙ্গাজলে।" তাই বলিতেছিলাম তুলনা দিয়া তাহাকে বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তিনিই তাঁহার তুলনা। হিরণ্ময়ীমুকুটধারিণী উষারাণীর সহিত তাঁহার তুলনা হয় না, অথবা—উদয়োন্মুখ লোহিত রাগরঞ্জিত তপন দেবের সঙ্গেই বা তুলনা দিব কি করিয়া ? কারণ তিনিই ত সবিতার জনক, পৃথিবীর একটি সূর্য্য নহে, কোটি কোটি সূর্য্যের তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহাকে পার্থিব বস্তুর সহিত তুলনা দেওয়া ভুল, কেন না তিনি যে, রূপ রস গন্ধ স্পর্শের অতীত, গুণাতীত ব্রহ্ম। সুতরাং জগতের সৃষ্ট পদার্থের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না।

সে যে হউক, সে আমায় ভালবাসে। তাহার ভালবাসার মধ্যে থাকিয়া আমি তাহাকে একটুকু আধটুকু ভালবাসিতে শিখিতেছি। সে করুণার সমুদ্র, প্রীতির নির্ঝর, স্নেহের গঙ্গাজল বলিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে আমার শুষ্ক মরুময় হৃদয়-বেলা সিক্ত হইয়াছিল। সে অতি মনোরম বলিয়া সে সৌন্দর্য্যের সহবাসে থাকিয়া এখন আমি বিশ্বকে আবার সৌন্দর্য্যময় দেখিতেছি। সে যে হউক, সে সব করিতে পারে, সে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত করিতে পারে, মরা গাঙে জোয়ার আনিতে পারে, কুৎসিৎকে সুন্দর করিতে পারে, পাষণ্ডকে দয়ালু করিতে পারে, বাঁকাকে সোজা করিতে পারে, পাষাণে পদ্ম ফুটাইতে পারে।

তাহার সরল প্রাণ, তাই সে সরলতা ভালবাসে। সে করুণার সাগর, তাই সে দুঃখীর দুঃখ দেখিতে পারে না। যে সরল প্রাণে তাহার নিকট প্রাণের কপাট খুলিয়া দেয়, সরলভাবে প্রাণের কথা তাহার পাদপদ্মে নিবেদন করে, সে তখন আর স্থির থাকিতে পারে না, অমনি তাহাকে সে সাদরে বক্ষে তুলিয়া নেয়। তাহাকে যাহাই বলি না কেন, কিন্তু কে—সে? ঐ যে অনিন্দ্যসুন্দর—মহামহিমময়—জ্যোতিঃপূর্ণমূর্ত্তি, যাহার আননে অমিয় হাসির লহর ছুটিতেছে, ঐ যে প্রেমে ঢুলুঢুলু—আঁখি—মন কাড়িয়া লইতেছে, ঐ যে করধৃত বাঁশীর গানে বিরাট বিশ্বের সংক্ষুব্ধ জীবকে সাদরে আহ্বান করিতেছে, কে—সে? মরি—

মরি—কি মধুর—কি মধুর! কি কোমল,—সুকোমল! কি সুন্দর, কি সুন্দর!

ঐ পতঙ্গের অনল প্রীতির ন্যায়, আমিও যে ঐরূপ দেখিয়া আর বাঁশী শুনিয়া মজিয়াছি! দৃষ্টি আর অন্যদিকে যায় না, চক্ষু আর ফিরে না। হৃদয়ের ভিতরে স্রোতস্বিনীর স্রোত রোধ করিবে কে? বল বল ভাবময়! কে তুমি? হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া, অযাচিত ভাবে স্নেহ, ভালবাসা বিলাইতেছ? রুগ্নাবস্থায় যখন একাকী নির্জ্জন প্রান্তরে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বৃক্ষতলে শায়িত হইয়া রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম, তখন আমার নিকট আসিয়া তুমি অতিথি হইলে! কি দয়ায় জানি না—কোন্ অনুগ্রহে বলিতে পারি না—দীনহীন অভাগায় দেখা দিলে!

তুমি নিজের দয়ায় নিজে প্রকাশ হইয়াছ, তবে পরিচয় দিবে না কেন? ভাবের ঠাকুর! ভাবে—আকারে—ইঙ্গিতে বলিয়া দাও না, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? প্রাণ-বন্ধো! ইহা তোমার কিরূপ ব্যবহার? আবার মনে হয়, কে—সে? সে যে হউক, আর তাহাকে বিরক্ত করিব না। এত তোষামোদ করিলাম, এত অনুনয় বিনয় করিলাম, কৈ তবুত সে পরিচয় দিলে না। প্রাণের বন্ধু—প্রাণে থাকিয়া তবুত আত্মগোপন করিল! ইহাপেক্ষা দুরদৃষ্ট কাহার?

প্রভো! কেন তুমি হাসিতে হাসিতে বলিতেছ, জগতের

যাহা কিছু দেখিয়াছ, সে সকলের কি পরিচয় পাইয়াছ? তবে তুমি আমাকে জানিবার জন্য কৌতূহলপরবশ হইতেছ কেন? তুমি নিত্য যাহা দর্শন করিতেছ, তাহার কয়টার পরিচয় পাইয়াছ? তাহাদের মধ্যে কেহ ত তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করে নাই! তুমি জানিতে যাহা চেষ্টা করিয়াছ, সে চেষ্টার ফলে তাহাদের পরিচয় জানিয়াছ। আমাকেও তুমি স্বরূপ বুঝিয়াছ, যতটুকু জানিতে চাহিয়াছ, ততটুকু জানিতে পারিয়াছ। চেষ্টা না করিয়া অধিক পাইবে কি প্রকারে? ঐ যে বিশাল-বিমান পথে শুভ্র যূথিকার মত নীলচন্দ্রাতপতলে অনন্ত নক্ষত্ররাজি—যাহা তুমি নিত্য সন্দর্শন করিতেছ, তাহার কয়টার পরিচয় তুমি জান? তাহার কয়টা আসিয়া তোমায় পরিচয় দিয়া গিয়াছে? ঐ যে অভ্রভেদী গিরি তোমার অদূরে চিরস্থবিরের ন্যায় অচল ভাবে দণ্ডায়মান, তাহার মধ্যে কি আছে, তাহার কি পরিচয় পাইয়াছ? আপনার উদ্যম বিনা তাহাদের পরিচয় পাইবে না। তোমার অনুনয়—বিনয়—তোষামোদ—রোদনে কেবল বাচালতা প্রকাশ পায় মাত্র। এইবার নীরব করিয়া দিলে ভাবময়! মূক হইলাম। মূর্খ আমি, অযথা প্রলাপ বকিলাম। তাইত—তাইত কে—সে? গিরিগুহানিঃসৃতা ঐ যে তরঙ্গিণী তরতর বেগে অনন্তকাল বহিয়া যাইতেছে, নিত্য উহাকে ত দেখিতেছি, উহার পরিচয়ই বা কি জানি? সত্যই কত ফুল উদ্যানে ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে, কত ফুল কোরকেই

বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার কয়টার পরিচয়ই বা লইয়াছি ? কত ভ্রমর মধুলোভে নিত্য ফুলসহবাস করিতেছে, তাহাদের কয়টার বা পরিচয় পাইয়াছি ? বিহঙ্গম নিত্যই সঙ্গীতালাপে কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দেয়, কিন্তু সে স্বর-সুধার মর্ম্মার্থ বা ভাবার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি কি ? কথাটা খুবই সত্য।

ভাবের ঠাকুর ! এক্ষণে ইঙ্গিতে যাহা বলিলে, তাহা হইতে বুঝিলাম, তুমি সাধনার ধন। মন—প্রাণ তোমার রাতুল চরণে সমর্পণ না করিলে তোমাকে পাইবার ত উপায় নাই। শাস্ত্রাধ্যয়নে তোমাকে পাওয়া যায় না, শুকপক্ষীর ন্যায় তোমার নামোচ্চারণ করিলেও ত তোমায় পাওয়া দুর্লভ, তোমায় পাওয়া যায়—ভাবের সহিত অশ্রু-বিগলিত ধারে কাতর ভাবে ডাকিলে।

নবনটবর কে তুমি ? আনন্দদাতা কে তুমি ? তুমি ভাল খেলা খেলাইতে পার ঠাকুর ! বলিহারি—তোমার অঘটন-ঘটনপটিয়সী মায়ায় ! তোমার শ্রীমুখের হাসি দেখিলে হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গের মালা ছুটিতে থাকে, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে ? তোমায় দেখিলে কেন প্রভু—আত্মহারা হইয়া যাই ? তবু তোমার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই না। বল না প্রভু ! তুমি কে ? বংশীধর ! দয়া করিয়া তোমার পরিচয় দাও। যদি আবার রুগ্নশয্যায় শুইতে বল, রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে বল, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে বল, তাহাই করিব। আর একবার দেখা দাও। কে তুমি দয়াল ঠাকুর !

এমন করিয়া তুমি বুঝি নৃত্য করিতে ভালবাস? তবে নাচ, নাচ, না নাচিলে, না নাচাইলে আমি এত নাচিতে পারিব কেন? নাচ নাচ নবনটবর! নিজের নাচে নাচিয়া জগৎকে নাচাও, আমাকে নাচাও, আর যে নাচিতে ভালবাসে, তাহাকে নাচাও। নাচ নাচ মনোবিহারী! ভাবের বাঁশী ধরিয়া প্রেমের নাচ নাচ, আমরাও তোমার সহিত তোমার বাঁশীর গানের তালে তালে নাচিতে থাকি। ঐ যে—সে বাঁশী ধরিল, নাচিতে লাগিল, কে—সে? এমন মনের মতন জন কে—সে? কি বিপদেই পড়িলাম গা? চাহিয়া তাহাকে দেখিতে পাই না, কল্পনায় রাখিতে পারি না, ধ্যানে ধারণা করা যায় না, ভাষায় বর্ণনা হয় না, অভিধানেও তাহার অর্থ বুঝিতে পারি না—সব গোল করিয়া দেয়, মূলে ভুল হয়, স্থূলে—দোষ ঘটে ও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শাদি সব ভুল হইয়া যায়। শ্রুতি, স্মৃতি, উপনিষদ, পুরাণ, কিম্বদন্তী, কোরাণ, বাইবেল জেন্দবস্ত প্রভৃতি সকল জাতির ধর্ম্ম ও দর্শন—মাত্র তোমাকে লইয়া নাড়া চাড়া করিয়াছে, তোমার স্বরূপ চিনিতে পারে নাই। কেবল "তুমি কে" বুঝিবার জন্য বিতণ্ডা করিয়াছে। আর আজ আমি তোমাকে দেখিয়াও "তুমি কে" স্থির করিবার নিমিত্ত প্রলাপ বকিতেছি। প্রভো! তুমি যে হও, সে হও, কিন্তু বুঝিলাম—তুমি নৈরাশ্যের কাতরতা,—যৌবনের চঞ্চলতা—অদৃষ্টের কঠোরতা—আশার ছলনা,—সবই দূর করিতে পার।

কি রূপ ?
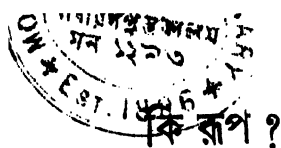
আহা কি দেখিলাম! নিদ্রা ভাঙ্গিল? আহা সে নিদ্রা কেন ভাঙ্গিল? নিদ্রাই যদি ভাঙ্গিল, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে আমার শান্তিময়,—আমার মধুময়—সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল কেন? তন্দ্রাঘোরে—আধ জাগরণে, আধ নিদ্রাবস্থায় যে দেবী মূর্ত্তি আমার মানস-নয়নে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, যাঁহার রূপ-মাধুরী দেখিতে দেখিতে আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম—জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, যাঁহার রূপ-সুধার প্রসাদ লইবার আশায় আমার চিত্ত-চকোর ব্যগ্র হইয়াছিল, তাহা কোথায় লুকাইল? সেই সৌন্দর্য্যময়, মধুরতাময় স্নিগ্ধ-শশি-কিরণ ক্ষণেকের জন্য আমার হৃদয়-কন্দর আলোকিত করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল? কে তাহার সন্ধান করিয়া দিবে? জাগরণ! কেন আমার অনির্ব্বচনীয় সুখে বাধা দিলে? কেন আমার সুখ-সৌধ ভূমিসাৎ করিয়া দিলে? কেন আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিলে? যদি সে সুখের স্বপ্নই ভাঙ্গিলে, তাহা হইলে কাহার মাথা খাইতে—কাহার সর্ব্বনাশ সাধিতে, আমি যাহা দেখিতেছিলাম, সে অনিন্দ্য-দেবোপম-নির্ম্মল-পবিত্র মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলাম না কেন? এস সুখ-স্বপ্ন! এস মহানন্দের সম্রাট! তুমি আমার হৃদয়ের জ্বালা ঘুচাইয়াছ, শীতের কুজ্ঝটিকা দূর করিয়াছ, দুঃখের রুদ্ধ কক্ষদ্বার উন্মুক্ত

করিয়াছ—ঘন-ঘোর-কৃষ্ণ-জলদ-জাল-সমাচ্ছন্ন প্রাবৃট্ নিশীথে শারদীয় পূর্ণ শশাঙ্কের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দেখাইয়াছ—কণ্টক-পূর্ণ কঙ্করাকীর্ণ নীরস অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে বসন্তের প্রমোদোদ্যান সৃজন করিয়া তোমার মহাসৃষ্টির অনন্ত গভীর লীলারহস্য দেখাইয়াছ,—শুষ্ক ওষ্ঠপুটে হাসি ফুটাইয়াছ,—কঠিনকে ভাল-বাসা শিখাইয়াছ—নেত্রজল মুছাইয়া দিয়াছ, তোমার সৃষ্টি নূতন। লোকে নূতন না বলিলেও আমি তোমায় নূতন বলিব। কেননা, আমি তোমাকে নূতন বলিয়া বিশ্বাস করি। যে বলে তুমি অমূলক—যে তোমার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহে না, সে তোমার স্বরূপ বুঝিতে পারে না, সে তোমার পরিচয় জানে না, অথবা জানিতে চেষ্টা করে না, সে অবিশ্বাসী, তাহার ধ্বংস নিশ্চয়, তাহার অধোগতি অনিবার্য্য।

কি দেখিলাম! যাহা দেখিলাম,আবার যে তাহা দেখিতে ইচ্ছা হয়, আবার যে তেমনি যন্ত্রণা পাইতে বাসনা হয়। মনে হয়—সেই রোগ, সেই যন্ত্রণা যেন কত সুখের, কত শান্তির, কত তৃপ্তির! পাঠক! আমায় তুমি বাতুল ভাবিবে, নির্ব্বোধ বলিবে, কিন্তু নীরো যখন গৃহে আগুণ লাগাইয়া আপন মনে বেহালা বাজাইয়া আপন অন্তরের পরতে পরতে আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তখন তাহাকে লোকে বাতুল ভাবিয়াছিল না নিষ্ঠুর ভাবিয়াছিল? তেমনি আমাকে যাহা হউক একটা ভাবিয়া লও, একটা কিম্ভূত কিমাকার জীবও ভাবিতে পার, কিন্তু আমার সেই রোগ—সেই যন্ত্রণা বড়ই প্রার্থনীয়—

আমার তাহাতেই আনন্দ। ঘৃণাভরে যাহার মুখের দিকে কখনও চাহি নাই, জীবনে কখনও যাহাকে আদর বা আপ্যায়ন করি নাই, দু'টো সুখদুঃখের কথা যাহাকে কোন দিন বলি নাই, সেই কিনা সেদিন আমার শিয়রে বসিয়া আমার রোগক্লিষ্ট বিষণ্ণ মুখে ব্যজন করিয়াছিল! যখন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়াছিলাম, নয়ন যখন আলোকের ক্ষীণরেখা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই, তখন "সেই আমার" আমার কাতর প্রার্থনায় আমার রক্ষা বিধানের ব্যবস্থা দিয়াছিল! আমি আবার জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। যখন দীর্ঘ রোগভোগের পর জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইল, যখন প্রথম চক্ষু খুলিলাম, তখন কাহার গণ্ড বহিয়া দর-বিগলিতধারে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে দেখিলাম? সে মানব না মানবী? দেবতা না দেবী? সে আমার কে? ভাষায় বলিতে পারিতেছি না, অন্তরে অন্তরে বলিতেছি, সে আমার সর্ব্বস্ব—সে আমার ইহকাল—পরকাল।

সংশয়বাদী, তুমি মনে করিতেছ, আমি ভ্রান্তি দর্শন করি-যাছি, আমি উন্মাদ হইয়া—প্রলাপ বকিতেছি, কিন্তু তুমি যাহা বল,—আমি আবার বলিব, সে দৃশ্য অমূলক নয়, চক্ষের বিভ্রম নয়, মানব আমার অবস্থায় আপনাকে স্থাপন করিতে না পারিলে—আমার মত না হইলে, আমার আনন্দ—আমার সুখদুঃখ কেমন করিয়া অনুভব করিবে? কেমন করিয়া তোমার সহানুভূতি আসিবে? কেমন করিয়া বুঝিবে, সেই

রোগে—সেই যন্ত্রণায় আমার জীবন-বৈতরণীর তপ্তসৈকতে সুখ ও শান্তির কি অমৃত-প্রস্রবণ ছুটিয়াছিল? রূপের কি অলকনন্দা তরতর বেগে কুলুকুলুনাদে বহিয়া যাইতেছিল? আর হায় হায়! আমি কিনা এত দিন গোস্পদে গড়াগড়ি দিতে ছিলাম! যখন জীবনের সুদীর্ঘ ভাটার সময় হইয়াছিল, যখন সে টানে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন তাহা জানিতাম না, তারপর তিলে তিলে, পলে পলে, দিনে দিনে হঠাৎ শক্তিসম্পন্ন হইয়া "আমি কে" বুঝিতে পারিয়া ছিলাম, আমার "কে সে" জানিতে পারিয়াছিলাম, আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম, এখন তাহা গত হইয়াছে বলিয়া কি আমি তখনকার অবস্থাকে আহ্বান করিব না? অকৃতজ্ঞ আর কাহাকে বলে? এ সংসারে অকৃতজ্ঞের পরিণাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জাজ্জ্বল্যমান দেখিয়াছি, বিশ্বাসঘাতকের দুর্দ্দশা কিরূপ ঘটে, তাহা শাস্ত্রেও পাঠ করিয়াছি, আমাতে সকলই হইয়াছে! আর কেন? ভুক্তভোগী লোককে অধিক বুঝাইতে হইবে কেন?

যাক্ সে কথা। আমি বলিতেছিলাম—সেই রূপের কথা। মরি মরি, সে রূপ কোন চিত্রকর তুলিতে অঙ্কিত করিতে পারে না, কোন বর্ণেই তাহার রং ফলান যায় না। আর কি সে রূপ দেখিতে পাইব না? সে রূপের বালাই লইয়া মরিতে সাধ হয়। সেই রূপ দেখিয়া সেই মুহূর্ত্তে মরিলাম না কেন? এ জীবনে কত রূপই দেখিয়াছি, কিন্তু

সে রূপের সহিত কি তুলনা হয়? একদিন মুক্ত বাতায়নে ত্রয়োদশবর্ষীয়া ব্রীড়াবনতমুখী সুন্দরী কিশোরীর রূপ দেখিয়া যৌবনসুলভ লালসার তাড়নায় মজিয়াছিলাম, পাগল হইয়া গিয়াছিলাম, সে রূপের বিনিময়ে জীবন দিতে কুণ্ঠিত ছিলাম না, কিন্তু হায়! সে ভাব হৃদয়ে কয়দিন ছিল? আবার যে দিন নির্জ্জন পল্লীপথে কলসীকক্ষে সদ্যঃস্নাতা আলুলায়িতকুন্তলা চম্পকবর্ণা ষোড়শীকে সন্দর্শন করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, যাহার রূপের তরঙ্গ যৌবন-জোয়ারে ভাসিয়া আমার হৃদয়-তটে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল, তাহাকে যখন প্রথম দেখি, তখন পাপ-পুণ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অবাধে কত যে গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলাম, কে তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে পারে? তখন আমার দৃষ্টিতে সে মাধুর্য্যের ললামভূতা—কিন্নরী-অমরীগণের সৌন্দর্য্যের সারভূতা—সেই দ্বিতীয়া তিলোত্তমার শ্রীচরণে সুন্দোপসুন্দের ন্যায় আত্মপ্রাণ বলি দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আবার কখনও তাহাকে শকুন্তলা ভাবিয়া মহারাজ দুষ্মন্তের ন্যায় আপনা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কখনও রূপবতী হেলেনা ভাবিয়া ট্রয় নগরীর ন্যায় আপনার গ্রাম ধ্বংস করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। কখনও মেহেরুন্নিসা ভাবিয়া ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীরের ন্যায় আপন বিষয়সম্পত্তি তাহার পাদপদ্মে অর্পণ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলাম। যে রূপ পদ্মিনীর রূপের ন্যায় ভাবিয়া

দিল্লী-সম্রাট আলাউদ্দিনের সদৃশ রাজ্য নাই হউক, আমার যথাসর্ব্বস্ব অবাধে, সানন্দে, অকুণ্ঠিতচিত্তে, অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম,—হায় হায়! সে রূপ ত কত দেখিয়াছি, তাহার জন্য কত কি করিয়াছি, সে রূপানলে পতঙ্গের ন্যায় কত দিন ছুটিয়াছি, কিন্তু শান্তি ত পাই নাই।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।"

আ মরি মরি! আমার এ রূপ যে তাহা হইতে দুর্লভ, তাহা হইতে মহার্ঘ্য, তাহা হইতেও মূল্যবান! এ রূপ দেখিলে চক্ষু আর পালটিতে চাহে না, পলক থাকে না, একেবারে স্থির হইয়া যায়।

রূপ অতি ভালবাসার সামগ্রী। জীবকে জ্ঞানহারা করিতে ইহার তুল্য আর কিছুই নাই। অতিবড়শত্রু তাহারও রূপে মুগ্ধ হইতে হয়। ইতিহাসে দেখিতে পাই, কত নবাবনন্দিনী পিতৃ-অরিপুত্রের রূপমোহে মজিয়া গিয়াছিলেন। আকবরশাহের সময় রূপের হাট বসিত, বহু রূপসী সেই হাটে রূপের পসরা লইয়া সমবেত হইতেন।

রূপের মোহে পতঙ্গ অনলে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। এ পৃথিবীতে রূপের জন্য লালায়িত নয় কে? অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে। ভাবুক অনন্ত লতাপত্র-শ্যামলা প্রকৃতির মনোরম রূপ দেখিতে না পাইলে ব্যথিত হন। যুবক যুবতীরা আপনাপন রূপে বিভোর। কত লোকে পাখীর রূপ দেখিয়া পাখী পোষে। ফুলের রূপ দেখিয়া

যুবক কুসুমমালা পরিধান করে। যুবতীরা আপনাপন যুক্ত-কবরীতে স্তরে স্তরে পুষ্পগুচ্ছ সাজাইয়া রাখে। চাঁদ তাহারা ভালবাসে, জ্যোৎস্না পাইলে প্রাণের কবাট খুলিয়া দেয়। ছেলেরা রংয়ের পুতুল দেখিয়া কান্না ভুলে।

রূপের সহিত চক্ষুর অতি নিকট সম্বন্ধ। যেখানেই রূপ, সেইখানেই চক্ষু সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাহারই মোহে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। সেখান হইতে আর সে যেন ফিরিতে চায় না, যেন সেই খানেই থাকিতে পাইলেই আপন জীবন সার্থক বিবেচনা করে। নীলাকাশে প্রস্ফুটিত বেলফুলের মত শুভ্র তারকারাজির প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন চক্ষু জুড়াইয়া যায়। যখন শীতান্তে বসন্তের অনন্ত তরুগাত্রে নব কিশলয়ের কমনীয় কান্তি দেখি, তখন চক্ষু শীতল হইয়া যায়। যখন শ্যামল অরণ্য, উচ্চ গিরিচূড়া, গিরিগুহা-নিঃসৃত নির্ঝরের বারি, অনন্ত সমুদ্রের তীর, কলকলনাদিনী কল্লোলিনীর সৈকতময় তট, তৃণাচ্ছাদিত নীল মখমলের আসনের ন্যায় বিস্তৃত প্রান্তর, নীল জলদকোলে সৌদামিনী—ইন্দ্রধনু, বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত শিখিপুচ্ছ, উষার স্বর্ণমুকুট, উদয়োন্মুখ রবিরাগ, কয়টীর রূপের কথা বলিব ? চক্ষু কোন্‌টা না চায় ? তাই বলি, চক্ষু রূপকে বড় ভালবাসে। রূপ পাইলে সে আর বড় কিছু চায় না। রূপ যেন তাহার সংসার-সাহারার সুশীতল নির্ম্মল সলিল। সে তাই লইয়া আত্মতৃপ্ত।

চক্ষু ত রূপকে বড় ভালবাসে, কিন্তু মন কি চায়? চক্ষুর অবস্থা যাহা, মনের অবস্থাও তাহা। চক্ষু আর মন যেন এই স্থলে দুই জনে দুই বন্ধু। চক্ষু যাহা দর্শন করে, তাহা অকপটে মনের নিকট আসিয়া ব্যক্ত করে, শেষে দুই বন্ধু মিলিত হইয়া দুই জনেই প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ-মদিরিকা পান করিতে করিতে বিভোর হইয়া যায়। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সকলের রূপ—সেরূপ দৃষ্ট্যাকর্ষক বা চিত্তাকর্ষক নহে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত বা সর্ব্বসাধারণবাচ্য হইতে পারে না। যাহা আমার চক্ষে অসুন্দর, তাহা অন্যের চক্ষে হয় ত অতি সুন্দর, যাহাকে দেখিলে আমার ঘৃণা হয়, হয় ত অন্যে তাহাকে লইয়া সচন্দনপুষ্পে পূজা করে। মোটের উপর রূপ সুন্দর, তাহা ভালবাসিবার বস্তু, প্রিয় ভাবিবার সামগ্রী, তবে ব্যক্তি বা জাতিভেদে তাহার আদর-অনাদর পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। রূপ উচ্চ নীচ ভেদাভেদ করে না, রূপ জাতি-গুণ-কার্য্য বিচার করিয়া দেখে না।

রূপে এত মোহ কেন? রূপ বড় একটা সামান্য নহে; রূপে অপার্থিব বস্তু আছেই। রূপ যদি পার্থিব বস্তু হইত, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর লোক হইয়া পৃথিবীর রূপে এত মুগ্ধ হইতাম না। যাহাতে তোমার, আমার, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, জায়া, কন্যা, পুত্র-পরিজনাদি—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ

প্রভৃতি জগতের সকলেরই লালসা, তাহাতে দেব-ভাব ত অবশ্যই রহিয়াছে, কিন্তু ইহাও মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, তাহাতে ঈশ্বরত্বও রহিয়াছে। ঈশ্বর যেরূপ সর্ব্বময়, সর্ব্বব্যাপক, রূপও তেমনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মিশ্রিত —সর্ব্বব্যাপ্ত—সকল স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। চক্ষু রূপ না দেখিয়া থাকিতে পারে না, মনও তাই চায়, তবে বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করে মাত্র। ইন্দ্রিয়পরবশ মনুষ্য! তুমিও রূপ না দেখিয়া থাকিতে পার না, আর ইন্দ্রিয়জয়ী, চিরসংযমী যোগী! তুমিও রূপের সাধক। যত কাল না তুমি সেই অরূপের স্বরূপ দেখিতে পাও, তত কাল তোমার সাধনা নিষ্ফল, তত কাল তুমি উন্মাদ, তত কাল তোমার যোগশিক্ষা অসম্পূর্ণ। আর যখন তুমি রূপ দেখিতে পাও, তখন তোমার সাধনা সিদ্ধ, যোগ সিদ্ধ, সবই সিদ্ধ ও সার্থক। যোগী যে রূপ দেখিবার নিমিত্ত পাগল, ভোগী ও সেই রূপের কণা দেখিতে সতত উদ্‌গ্রীব ও উদ্‌ভ্রান্ত।

বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই, শ্রীধর, সনাতন, শ্রীনিবাস, নরোত্তম প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্ণবগণ সকলেই ঐ রূপেরই কাঙ্গাল ছিলেন। রূপের প্রয়াসী হইয়াই তাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ছিলেন। আহা! গোরার সে রূপ কি অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত— অসীম! তাই বলিতেছিলাম, রূপ তুমি সামান্য নহ, তুমিই ধন্য! তোমায় চিনিতে পারিলে ভগবানকে চিনিতে পারা

যায়! তোমায় বুঝিতে পারিলে ঈশ্বরতত্ত্ববোধ জন্মে। রূপ তুমি কুলটায়—কুললক্ষ্মীতে, পিতায়—মাতাতে, ভ্রাতায়—ভগ্নীতে, জামাতা—কন্যাতে, জগতের নর ও নারীতে—প্রকৃতির সকল পদার্থেই মূর্ত্তিমান! সকলেই তুমি বিরাজমান! এত শক্তি কাহার? এত মহিমা কাহার! তবে রূপ। তোমার রূপ দেখিতে তাহার মধ্যে আমরা পাপ-পুণ্যের বিচার করি কেন? যাহার শক্তি এত প্রবলা, মহিমা এত অপার, সে রূপ বিলাসীর বিলাস-ভবনে থাকুক, ঋষির শান্তিময় পবিত্র তপোবনে থাকুক, নরকে বা স্বর্গে থাকুক, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাকুক, তাহাকে ভালবাসি, প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসি, তাহাতে আবার পাপপুণ্য কি? পাঠক! তর্ক করিয়া দেখ, পরাজিত হইবে। যাহাতে তৃষ্ণা মিটিল, আকাঙ্ক্ষা পূরিল, বাসনার ক্ষয় হইল, তাহাতে কলঙ্ক প্রদান করিলে, বাস্তবিকই মনে একটা অব্যক্ত অরুন্তুদ বেদনা—বাস্তবিকই কি যেন কি একটা ভাবনা আসে।

আ মরি মরি। কি দেখিয়াছিলাম! সেই অপরাজিত, অপরিচিত, বর্ণনাতীত রূপ কোন্ মহিমা-সাগর সমুদ্ভূত? কোন্ অমিয় ছাঁকিয়া তাহার আকার গঠিত হইয়াছে? আমরি রে! তাই বুঝি বৃন্দাবনবাসিনী ভক্তিমতী আহিরিণীগণ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের রূপসাগরে ডুবিয়া থাকিবার জন্য কৃষ্ণ-রূপসাগর-শায়িতা শ্রীরাধিকার সঙ্গিনী হইয়া ছিলেন? রূপ যদি এত মধুর না হইত, তাহা হইলে শ্যামরূপতৃষিতা গোপবালাগণ

কখনই অবাধে নারীর সর্ব্বস্ব কুলমান জলাঞ্জলি দিয়া নীলযমুনার মধুময় পুলিনে উদাসিনী ভাবে ছুটাছুটি করিতেন না। রূপে কুল যায় গো! রূপে মান যায় গো! লজ্জা—ঘৃণা সব দূর হইয়া যায়।

রূপের অনলে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ নরনারী পুড়িয়া খাক্ হইতেছে! গুমে গুমে পুড়িয়া মরিতেছে! দাউ দাউ অনলে "পরিত্রাহি পরিত্রাহি" শব্দে বিশ্ব চমকিত করিতেছে! এই রূপের অনলে সমস্ত ট্রয়নগরী ভষ্মীভূতা হইয়াছিল, এই অনলে পুড়িয়া মরিবার জন্যই সুরাসুরত্রাস দশানন রাবণ ধরণীসুতা সীতাকে হরণ করিয়াছিল, তাহারই ফলে স্বর্ণপুরী লঙ্কা অনলে পুড়িয়া পাংশুতে পরিণত হইয়াছিল, কৃষ্ণার রূপের অনলে স্বয়ম্বর সভায় বহুরাজকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল, রুক্মিণীর রূপের অনলে চেদিবংশ পুড়িয়া গিয়াছিল, তিলোত্তমার রূপের অনলে সুন্দ—উপসুন্দের অস্তিত্ব দূর হইয়াছিল, ক্লিউপেট্রার রূপের অনলে জুলিয়াস্ শীজারের অতুল শৌর্য্য ভষ্মীভূত হইয়াছিল,—মার্ক আণ্টনীর বীরত্ব দগ্ধ হইয়াছিল, রাজপুতানা মুসলমান করতলগত হইয়াছিল, আর্য্যাবর্ত্তের জয়স্তম্ভবীরত্বের লীলাভূমি চিতোর—যাহার কীর্ত্তি-মেখলা বসুধা-বেষ্টিত, সেই চিতোর পদ্মিনীর রূপে শ্মশান হইয়াছিল। রমণীর রূপের অনলে কত যোগী ঋষির তপোসঞ্চিত পুণ্য যে ভষ্মীভূত হইয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? মেনকার রূপের অনলে বিশ্বামিত্রের বহুকালের কষ্টসঞ্চিত তপোলব্ধ

ফল দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেবল মানব কেন—দেবতারাও নারীর রূপের অনলে গুমে গুমে পুড়িয়াছেন। মানবীর রূপে দেবতারাও যে মজিয়া ছিলেন, তাহা দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় দেখিতে পাওয়া যায়। অহল্যার রূপের অনলে দেবরাজ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত দগ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আবার মনে এ ভাবেরও উদয় হয়, চন্দ্রের কলঙ্ক না থাকিলে, বোধ হয় চন্দ্রকে লোকের এত ভাল লাগিত না, রূপে পাপ না থাকিলে ধরণী এত পুণ্যময় পরম পবিত্র হইত না।

আহা! কেন সে রূপ দেখিলাম। যদি দেখিলাম, তাহা হইলে দিবারাত্রি তাহাকে দেখিতে পাই না কেন? তাহা যদি পাইতাম, তাহা হইলে চক্ষু সার্থক হইত, মনে চিরশান্তি বিরাজ করিত। একের বিহনে এমন সুখের হাটে দুঃখের বেচা কেনা করিতে হইত না।

অহো কি বলিতে কি বলিতেছি? বাস্তবিকই ইংরাজী সাহিত্য পড়িয়া আমাদের দর্শনে চালিশা ধরিয়াছে। তাই আমরা এত বাহ্য দর্শন লইয়া সুখদুঃখের সমালোচনায় ব্যস্ত হইয়া পড়ি। চর্ম্ম চক্ষুতে যাহা দর্শন করা যায়, মানস নয়নে তাহা দর্শন না করিলে প্রকৃত যে দর্শনের কার্য্য হয় না—তাহা আমরা একেবারে ভুলিতে বসিয়াছি। বাল্যকাল হইতে পাশ্চাত্যেরই অনুকরণ করিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্য জনেরা যাহা বলেন, আমরা তাহা বলি, তাঁহারা যাহা করেন, আমরা তাহা করিতে ভালবাসি। তাঁহারা বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস,

ভারতচন্দ্র পড়েন না, আমরাও পড়ি না, তাঁহারা সেলিবাইরণ পড়েন, আমরাও পড়ি। তাঁহারা বাহ্য জগত লইয়া মুগ্ধ, আমরাও তাই। আধ্যাত্মিকতার দিক্‌টা একবারও দেখিনা। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টি হইতে অন্তর্দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম। চর্ম্মচক্ষের গতি রোধ করিয়া যদি একবার মানসনেত্রে সে রূপ দেখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই,? দেখিতে পাই—সেই অনৈসর্গিক, প্রকৃতিদুর্লভ, অসীম, অনন্ত সুন্দর রূপ! সেই বচনাতীত নিত্য শান্তিপূর্ণ, মধুর অমিয় মাখান সৌম্যরূপ। সেই রূপে যেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া রহিয়াছে! তাহার কণামাত্র সৌন্দর্য্য লইয়া অভ্রভেদী অত্যুঙ্গ শ্বাপদপূর্ণ মহাগিরি, নীলবারিময় উত্তাল তরঙ্গসংক্ষুব্ধ অনন্ত অপরিসীম মহাসমুদ্র, তৃণশষ্পময় সুশ্যামল বিস্তীর্ণ অরণ্যানী। তাহার কণামাত্র মাধুর্য্য লইয়াই পশুপক্ষী সুন্দর, ফুলফল সুন্দর, নদনদী সুন্দর, লতাপত্র—ময়ূরপুচ্ছ সকলই সুন্দর। ওগো! সে রূপে যে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছি। যোগী যে রূপ দেখিতে পাগল, ভোগী যে রূপের কণা দেখিবার জন্য সতত উদ্‌গ্রীব ও উদ্‌ভ্রান্ত, আমি সেইরূপ তাহাতে দেখিয়াছি! তাই বলিতেছি, আমরি মরি—কি দেখিলাম! এখনও সে রূপ-সাগরে আমার হৃদয় ডুবিয়া রহিয়াছে! আমি চর্ম্মচক্ষে যদিও তাহা এখন দেখিতে পাইতেছিনা, কিন্তু মানস-নয়নে দিব্য দেখিতে পাইতেছি, আর সেই রূপামৃত পানে বিভোর হইয়া যাইতেছি। সে

অপার্থিব রূপের কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাই বার বার বলিতেছি—কি রূপ! কি রূপ! বাল্যে পুতুলের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম যৌবনে সুন্দরী যুবতীর রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলাম, আর আজ আমার অভিলষিত সেই সকল রূপ যেন একত্র মিশ্রিত হইয়া অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় রূপে পরিণত হইয়াছে। সে রূপ-সাগরে সুধু ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, কথা বলিতে ইচ্ছা করে না, কথা বলিলে হয় ত সে রূপের জমাট ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া ভয় হয়। সে রূপের কি বর্ণনা করা যায়? তাহা অনির্ব্বচনীয়! তাহা ভোগ করিতে হয়, বুঝাইতে পারা যায় না। কেহ কখন যাহা পারেন নাই, আমি তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? কেমন করিয়া তোমাকে বলিব যে, সে কি রূপ!

আমি।

কে সে? এত করিয়াও তাহাকে ত বুঝিতে পারিলাম না। বুঝিবার জন্য বুদ্ধির নানা ভাবপ্রেরণায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে সে আনন্দময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলাম কৈ? প্রতিষ্ঠা ত দূরের কথা, যতক্ষণ—যতবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, ততক্ষণ—ততবার আমার পাঞ্চভৌতিক দেহের নিভৃত গুহার কোন তমোময় নির্জ্জন স্থান হইতে জলদধ্বনিতে কে যেন বলিতেছে "কে—সে" পরে স্থির করিবে, কিন্তু অগ্রে তুমি কে তাহাই স্থির করিয়া লও। যে প্রবল চিন্তা-বন্যা হৃদয়-তট প্লাবিত করিয়াছিল, সহসা তাহা সরিয়া গেল। আবার বন্যাবিধ্বস্ত তৃণ-শষ্পসকল দেখা দিল, জলাবৃত তটভূমি যেন রঙ্গমঞ্চের যবনিকা ভেদ করিয়া আবার সাধারণ নর-নয়নের গোচরীভূত হইল! ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই "আমি কে?"

পাশ্চাত্য দর্শনবাদিদের মতে "চিন্তা, ভাব বা কার্য্যাবলীর সমষ্টিই আমি" কিন্তু তাহাই কি সত্য? কে ঐ গুলিকে ধরিয়া রাখিতেছে? কে ঐ বিভিন্ন উপাদানগুলির একীকরণ সমাধা করিতেছে? কে বিচ্ছিন্ন ভাবরাশিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অহং বুদ্ধির উদ্ভব করিতেছে? ভাবের ত পলে পলে পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু অহং বুদ্ধির ত কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না;

তবে যে আমি কেবল ভাবের বোঝা—ভাবের সমষ্টি, ইহা বুঝিব কিরূপে?

সাধুমুখে, শাস্ত্রবাক্যে আবহমান শুনিয়া আসিতেছি—প্রাণ, শরীর বা মন কোনটাই ত আমি নয়। কেন না, প্রাণের ধ্বংস আছে, শরীরের ক্ষয় আছে, মন সুখদুঃখ অনুভব করে, কিন্তু আমি এ সকলের অতীত। আমার ধ্বংস নাই, ক্ষয় নাই, সুখদুঃখে আমাকে অভিভূত করিতে পারে না, সুতরাং "আমি কে" ইহা জানিবার কৌতূহল কাহার না জন্মিয়া থাকে? কিন্তু কৈ? কিছুতেই ত বুঝিতে পারিতেছি না—"আমি কে"? আমার বুদ্ধি, আমার কর্ম্ম, আমার পুত্র, আমার পত্নী, আমার কন্যা, আমার সংসার, আমার অর্থ, আমার অট্টালিকা এই বলিয়া দিবানিশি চীৎকার করিতেছি—বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিরাট কোলাহলের হলহলা তুলিতেছি—কত দ্বেষ, কত ক্রোধ, কত বিবাদবিসম্বাদের সূত্রপাত করিতেছি—মানাভিমানের গৌরবপতাকা স্বরূপ বিবেকবুদ্ধিকেও পদদলিত করিতেছি, কিন্তু কৈ—আমার সেই অতি সাধের "আমি"? যাহার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব পূজার জন্য প্রদান করিয়াও আত্মতৃপ্তি উপভোগ করিতে পারি নাই, অথচ যাহার মোহে "আমার" বলিয়া সারাজীবন হারাইয়া ফেলিলাম, সেই "আমি"র সন্ধান কোথা হইতে পাইব? নিয়ত-আনন্দ-মুখর বাসে—না নির্জ্জন-শ্যামলা তরুলতা সমন্বিত বিপিনে—

না কুলুকুলুনাদিনী কল্লোলিনীর শান্তিময় পুলিনে—না নিভৃত গিরিগুহাশ্রিত ঋষির পবিত্র তপোবনে?

হে পরম বন্ধো "আমি"! কোথায় তুমি? আমি যখন কোন গৌরবের কার্য্য করি, তখন "আমি", আমি তোমাকে "আমি" বলিয়া সম্বোধন করি। যখন সুখবিলাসিতার সুশীতল হ্রদে স্নাত হই, তখনও তোমাকে 'আমি' বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকি। কৈ—তুমি আমার এত সন্নিধানে থাকিয়াও আমাকে কেন ধরা দিতেছ না? আমি তোমার কি করিলাম? কোন্ মহাপাপে, কোন্ আসক্তির মহাকর্ষণে "আমি" তোমায় দেখিয়াও দেখিতেছি না? বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না? বাল্যকালে পিতামহের নিকট কৌটিল্যের অবতার পণ্ডিতবর চাণক্যের এক শ্লোক অভ্যস্ত করিয়াছিলাম,

"ত্যজেদেকং কুলস্বার্থে গ্রামস্বার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্বার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥"

আমি অর্থাৎ আত্মা মানবের কুল, গ্রাম, দেশ এমন কি সমগ্র ধরণী হইতেও শ্রেষ্ঠ। তখন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম মাত্র, অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এখন কতকটা বুঝিতেছি "আমি" কে? আমি আমার বংশ অপেক্ষা বড়, আমার প্রাণ অপেক্ষা বড়, আমার দেশ অপেক্ষা বড়, তাহা কেন—আমি সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও বড়। আমি আমার সাধারণ বস্তুর মধ্যে নহি, আমি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আবার ইহা দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে পারা যায় যে,

আমি অতি পবিত্র এবং আমার "আমি" সকলের অপেক্ষা বৃহৎ। সেই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া আমাদের আর্য্য ঋষিগণ আত্মাকে ব্রহ্মের মধ্যে সমাপ্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সংসারের সমুদয় দ্রব্যই জলবিম্ববৎ—এই আছে, এই নাই। তাহা অপ্রতিহত অবিরাম গতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সে গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। শরীরটা কিছুই নয়—কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। কিন্তু ইহারই মধ্যে "আত্মারাম আমি" বিরাজ করিতেছেন, অথচ চর্ম্ম-চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। ইহজীবনে যে দেখিতে পাইব, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ?

তন্ত্র প্রভৃতিতে দেখিতে পাই—"ব্রহ্মাণ্ড-লক্ষণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতং" যাহা ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তাহা দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত রহিয়াছে, সুতরাং তাহাকে অবগত হইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডকেও অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডকে অবগত হইয়া তাহাকে বাদ দিলে যিনি থাকেন, তিনিই আত্মা। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞান না হইলে আত্মজ্ঞান জন্মে না। আবার সেই ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যক। সেই তত্ত্ব কাহারও মতে চতুর্ব্বিংশতি, কাহারও মতে সার্দ্ধ চতুর্ব্বিংশতি ইত্যাদি নানা মতে বিভক্ত। যাহাই হউক, এই রূপে দেহের বিষয় অবগত হইতে পারিলেই আত্মজ্ঞান আসিবে। তখন ঈশ্বর

সদৃশ হইবে। বেদ বলিতেছেন—"ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি। ইহা বড়ই জটিল তত্ত্ব। বুঝিলাম কি? শুক-পক্ষীকে যখন হরিনাম শিক্ষা দেওয়া হয়, সে কি সেই হরিনামামৃত রসের প্রকৃত আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারে? তুমি হয়ত বলিবে—ঔষধের ক্রিয়া ব্যর্থ হইবে কেন? আমি বলিব—তাহা হইলে মানুষ মরে কেন? তর্ক চলিল। কিন্তু আর তর্ক করিতেও প্রবৃত্তি আসিতেছে না, শুনিয়াছি—"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর।" সুতরাং আমি যখন "আমি" অন্বেষণ করিতেছি, তখন আমি আমার যত নিকটে থাকিতে পারি, আমি ত তাহারই চেষ্টা করিব, দূরে থাকিলে সন্ধান পাইব কিরূপে?

তুমি হয়ত বলিবে, যাহাকে দেখিতে পাও না, যাহার বিষয় অপ্রত্যক্ষীভূত, তাহাকে লাভ করিতে বা জানিতে এত ব্যস্ত কেন? কেন যে ব্যস্ত হই, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। তবে অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি মানবের প্রবল, তাহারই ফলে মন জানিতে চায়, "কোথা হইতে আসিলাম, কেন আসিলাম, জীবনের শেষ হইলে কোথায় যাইব, জীবনের চরম লক্ষ্য কি?" চারিত্র্য ও দর্শনের সাহায্যে জানিতে পারি, আত্মতত্ত্ব জ্ঞানেই (Self realisation) এই জীবনের লক্ষ্য অহংকে জানিতে হইবে। মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্যই আত্মার সাক্ষাৎ লাভ। যদি তাহাই হইল, তাহা হইলে আমরা সেই আত্মাকে সহজে উপলব্ধি করিতে

পারি না কেন? তাহার কারণ এই যে, বিষয়াসক্ত জীবের আত্মা, তাহার প্রকৃতি, মন এবং শরীরের সহিত সংলিপ্ত। আমার স্থায় মোহ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ যে প্রকৃতি, মন এবং শরীরকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহার কারণ আমাদের চিত্তে মোহের নানারূপ তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই তরঙ্গে মোহাসক্ত জীবের আত্মাকে আবৃত করিয়া ফেলে। যখন যে যে তরঙ্গ আসিয়া আত্মাকে আবৃত করে, তখন সেই সেই তরঙ্গের প্রকৃতিতে আমরা আপনাপন আত্মাকে অনুভব করিতে থাকি। হিংসা, দ্বেষ ক্রোধাদি তরঙ্গ উপস্থিত হইলে, আত্মাকে হিংসাযুক্ত, দ্বেষযুক্ত, ক্রোধযুক্ত, ইত্যাদি দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার মধ্যেও আত্মার প্রতিবিম্ব দেখা দিয়া থাকে। এই সকল যে এইরূপ ভাবে দেখা যায়, তাহার হেতু আর অপর কিছুই নয়, মাত্র—পূর্ব্ব সংস্কার। পূর্ব্ব সংস্কার হেতু ঐ সকল তরঙ্গ আসিয়া থাকে। তজ্জন্য পতঞ্জলি কহিয়াছেন—"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ব নিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ" অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য সংস্কারকে অবরুদ্ধ করে, তাহার গতিরোধ করিতে পারিলে নির্ব্বীজ সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার এরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে, আমাদের চিত্তে যে সকল তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সকল তরঙ্গকে এক করিতে পারিলে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ চিত্র দর্শন করা যায়। তাহা হইলে আর নানা

তরঙ্গ চিত্তে আসিতে পারে না। আবার সেই তরঙ্গ চলিয়া যাইলে নির্ব্বীজ সমাধি আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। তখন আত্মাও নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হন। কিন্তু নানা তরঙ্গকে একটী তরঙ্গে পরিণত করা চাই, তাহা যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ ত আর তরঙ্গের নিবৃত্তি পাইবে না—তরঙ্গশূন্য হইবে না।

এখন বুঝিলাম, আমার "আমি" আমার অতি নিকটে থাকিয়াও বহুদূরে রহিয়াছে। তাহাকে ধরা বড় সহজ কথা নহে—সহজ কার্য্য নহে; তাহাকে পাইতে হইলে শুধু কামনায় হইবে না, কার্য্য করা চাই। আবার শুধু কর্ম্ম করিলেও চলিবে না, কর্ম্মে কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হইবে—তবে আত্মারামকে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। কি করিয়া তাহাকে লাভ করিতে হয়, কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারা যায়, তাহা তাহার সাধকগণ বিশেষ ভাবে, ভাব-জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমি যখন ক্ষীণ-মস্তিষ্ক হইয়া পড়ি, তখন তোমার লাভ ধারণারও অসাধ্য হইয়া পড়ে, আবার যখন উদ্যম, সাহস আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমি তোমায় ধরিয়াছি বলিয়া মনে করি। এখন বুঝিতেছি স্বশক্তিময় জ্যোতির্ম্ময় পরম দেবতা! তোমার তুলনা আর কেহই নাই।

প্রভো! তুমি অনন্ত সৌরব্রহ্মাণ্ডের মহাকেন্দ্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া চির ভ্রাম্যমান জগতকে আকর্ষণ করিতেছ, আমি যেন

চিত্ত-প্রবাহে দেখিতে পাইতেছি,—সেই অনন্ত সৌরব্রহ্মাণ্ড সেই তরঙ্গে ডুবিতেছে, আর উঠিতেছে। আর তুমি উহার মধ্যে চাপা পড়িয়া আমার চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছ। এস আমি! অত দূরে কেন? বাসনায় জড়িত হইয়াছি বলিয়া কি এত দূরে রহিয়াছ? কৈ প্রভো! হৃদয়ে ত আর কোন বাসনাই রাখি নাই। তোমায় আমায় প্রভেদ কি প্রভো! তুমিই আমি—আমিই তুমি। তবে এখন প্রকাশিত হও। স্থির হইয়া থাক। আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় নিরীক্ষণ করিতে থাকি। তোমার জ্যোতির্ম্ময় কান্তি, তোমার সজল-জলদ-গম্ভীর ধ্বনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমস্ত জগৎ চমকিত করিতেছে। তোমাকে দেখিলে শোক, দুঃখ, শ্রান্তি, জরা, বিচ্ছেদ সকলই ভুলিয়া যাই। তাই তোমাকে সাদরে আহ্বান করি—পূজা করি। তোমাকে পাইলেই যেন এক নব জীবন লাভ করিয়া থাকি। বিরাট্ তমসাময়ী রজনীর পরমায়ু চন্দ্রমা অস্তমিত হইলেই যে, এক সুখের প্রভাত অমৃত-হিল্লোলে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া সমুদিত হইবে—কে না আশা করিয়া থাকে? যাহাই হউক, এখন "আমি" তোমাকে আমি কতকটা যেন বুঝিতে পারিতেছি, মনে করি। "যেরূপ" দেখিয়া আমার সমগ্র জীবনের আকাঙ্ক্ষা একটী সাধের কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, তাহা এখন সার্থক হইয়াছে। যে উদ্দীপনায় আমার শরীরের যাবতীয় রোম কণ্টকিত হইয়াছিল, তাহার হেতু নিরূপণ করিয়াছি। "কে—সে" আর "আমি" বড় একটা

বিভিন্ন মূর্ত্তিবিশেষ নহে। তাহাতে আর আমাতে এক। অনন্ত বারিধি ও বারিবিন্দুতে যে প্রভেদ, দ্রব্য ও অণুর মধ্যে যে প্রভেদ, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের যে প্রভেদ, তাহাতে আর আমাতে সেই প্রভেদ। প্রভেদ—আমি ক্ষুদ্র সে বৃহৎ, আমি সসীম, সে অসীম। একই—নামমাত্র বিভিন্ন। আমি তাহাতে যখন মিশিয়া যাইব—আমার আমিত্ব ভুলিয়া যাইব, তখন ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইব; আর যখন এই তত্ত্ব, প্রাণে প্রাণে ধারণা করিতে পারিব, তখনই বলিতে পারিব, "সোঽহং" উভয়েরই সত্ত্বা এক। কে সে? সে পরমাত্মা আমি আত্মা। কেবল আমি চাপা পড়িয়া সেই নিত্যানন্দময় পরমাত্মা হইতে যেন দূরে রহিয়াছি বলিয়া মনে হয়। এই আমি অনাদি অনন্তকাল হইতে। আমি যে কতবার এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও নক্ষত্রাদির সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতে দেখিয়াছি, কে বলিবে? আমাকে ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে কেন? আমার সম্মুখে যে কত বহু জন পদ বিশিষ্ট ভূখণ্ড আটলান্টিক প্রভৃতি জলধি গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; আমি কুরুক্ষেত্র, পলাশী, পাণিপথ বা গ্রীক রোমের ঘোর সংগ্রামের ন্যায় কত যে ভীষণ যুদ্ধ দর্শন করিয়াছি, কে বুঝিবে? আমিই এককালে মহা প্রেমিক ঋষিপ্রতিম বীর ফ্রাঙ্কলিন সদৃশ ছিলাম, আবার কালে পাপের প্রতিমূর্ত্তি ম্যাকিয়াভিলি সাজিয়াছিল। আমিই কত নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্য দিয়া আলোক আনিয়াছি, আবার কত আশার

আলোকের দীপ্ত রশ্মি নির্ব্বাণ করিয়া দিয়াছি। কখন দেশের দণ্ডমুণ্ডকর্ত্তা রাজা হইয়াছি, আবার কখন নগণ্য অপরাধী প্রজা হইয়া রাজার নিকট অবনতমস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিয়াছি। কয়টীর কথা বলিব? যাহাদের আমিত্ব জ্ঞান নাই, তাহাদেরই জগতের ইতিবৃত্ত জানিতে কৌতূহল জন্মে; তাই তাহারা ইতিহাস পাঠ করে। আমিত্ব জ্ঞান জন্মিলে আর তাহার কিছুরই প্রয়োজন হয় না। যোগী নিবিড় বনমধ্যে আজীবন যোগাভ্যাস করিয়াও, সংসারতত্ত্ব জ্ঞাত হইলেন কিরূপে? শাস্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাই, ঋষিগণের এরূপ সংসারাভিজ্ঞতা ছিল যে, ঘোর সংসারীরাও সেরূপ ছিল না। ইহার অপর কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এক আমিত্ব জ্ঞানই তাঁহাদের এই বিশ্বজনীন বিরাট জ্ঞানের সহায়তা করিয়াছিল।

আমি! আর না, চল চল, কোথায় যাইলে তোমাকে আমি দিবারাত্রি হৃদয় খুলিয়া—নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইব, সেইখানে চল। তুমি কে আর কে সে, সকলই বুঝিতেছি; ধরা দাও, ধরার যাতনা ভুলিয়া যাই। বিষয়-স্মৃতি টুটিয়া গিয়াছে, তবে তুমি আমায় ধরা দিবে না কেন? একদিন এই ভাব আসিল। আমি সেই জীর্ণ কুটীরে বসিয়াছিলাম, সেইখানে যেন আবার আমি—আমাকে উকি ঝুকি দিয়া দেখিতে লাগিল, আমি তাহাকে এই বিরাট্ বিশ্বের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে দেদীপ্যমান দেখিতে লাগিলাম! হৃদয়

পুলকে নাচিয়া উঠিল! শরীর কম্পিত হইল! অশ্রু বহিতে লাগিল! দৃষ্টি—স্থির হইল! ঐ যা—আবার কোথায় চলিয়া যাইল—চকিতে চলিয়া যাইল। এই ছিল, সাধনের নিধি কোথায় যাইল? কোন্ চোরে কি চুরি করিল? দণ্ডায়মান হইলাম। স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাহার অনুসন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটিলাম। বাহ্যজ্ঞান ছিল বলিয়া বোধ হইল না।

শ্মশান।

গ্রামোপকণ্ঠে একটী ক্ষুদ্র তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ডে শাখা-পত্রবিহীন দুই একটী দীন অশ্বত্থ তরু ইতিহাসজ্ঞ বক্তার ন্যায় অতীতের পুরাবৃত্ত কহিতেছিল। উহাদের পার্শ্বে অর্দ্ধ দগ্ধ অস্থি, ছিন্ন কন্থা, শব-বস্ত্র, নর-কপাল ও নরকঙ্কাল-সমূহ বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হইয়া কোন শোক-সাগর হইতে ভাসিয়া আসিয়া ভবিষ্যৎ পরিণতির শোকাবহ সঙ্গীত গাহিতে-ছিল। ক্বচিৎ দুই একটী রক্তপায়ী ও মাংসাশী কুক্কুর-শৃগালকে তথায় উঁকি ঝুঁকি করিতে দেখিয়া, তাহাদিগকে সেই ভূখণ্ডের অধিবাসী বলিয়া বোধ হইতেছিল। উর্দ্ধ গগনমণ্ডলে কয়েকটা শকুনি-গৃধিনী যেন কোন অভিলষিত বস্তু লাভের নিমিত্ত এক দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। হুহু করিয়া বৈরাগ্যের প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। একি কোথায় আসিলাম? এখানে আসিবামাত্র আমার চিত্তের এরূপ অবস্থা ঘটিল কেন? আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন কোন মহা সাধকের সাধনা-মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছি। মানুষ সারাজীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া ক্ষার হইলে নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া যেন শান্তি লাভ করিতে পারে। সে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই যেন দেখিতে পায়। যে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-দর্শী, সেই ত সুখী। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, যাহা হইবার তাহা হইবে, যাহা হইবার তাহা ত দেখিতেছি, সুতরাং

আর ভাবনা কি রহিল? আমি ত এখানে তাহার সকলই দেখিতেছি—কোনটীরই অভাব বোধ করিতেছি না। তাই বলিতেছি, ইহাই কি মানব-জীবনের শান্তিধাম—বিশ্রাম ভূমি?

এই মনুষ্য-রাজ্যে দেখিতে পাই, তাহাদের আবাসভূমির অনতিদূরে এইরূপ এক একটা শান্তিময় অন্তিমক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতেই মনে হয়, মানবের মায়া দূর করাইবার জন্যই প্রত্যেক স্থানে ইহার আবির্ভাব। যিনি ইহার স্রষ্টা, নিশ্চয়ই তিনি একজন মহাজন।

তিনি মায়াক্ষেত্র—সংসারক্ষেত্রে বৈরাগ্য আনয়নের নিমিত্তই যেন এই ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কেন না, এই-খানেই আসিলে মায়াময় জগতের নিবিড় অন্ধকার আপনা হইতেই অপসৃত হইয়া যায়। পিতা, মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী, ভ্রাতা, আত্মীয়-পরিজনের সম্বন্ধ-বন্ধন উন্মুক্ত হইয়া পড়ে! এই চর্ম্মচক্ষুর মধ্য দিয়া আর একটী দিব্য নয়ন প্রকাশিত হয়। অমনই সে নয়নের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার ব্রহ্মাণ্ড-রূপদেহে কোথায় আমার "আমি" রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সব দেখিতে পাইতেছি, ইহাই সেই নির্ব্বিকার ক্ষেত্র—**"শ্মশান"।**

এই স্থানে সকলেই আপনাপন গৌরব, মান, কীর্ত্তি, স্মৃতি, অখ্যাতি ইত্যাদি উত্তরাধিকারী রাখিয়া, স্ব স্ব কার্য্য-ফলানুযায়ী গন্তব্য পথে প্রস্থান করে। এইখানে ভস্মমাত্র জীবদেহের অভিজ্ঞান। যেন এই এক ভস্মেই বিরাট

ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমাজের সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। আবার পরিণামে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের জীবদেহ ভস্মই হইবে,—ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে। চিতাভস্মের সঙ্গে সঙ্গে সকল কর্ম্মের অবসান ভুল—মিথ্যা কথা। তখনই ত কার্য্যের সূচনা, তখনই ত জীবনারম্ভ।

আহা শ্মশান! তুমিই ধন্য! তুমি কত প্রাতঃস্মরণীয় মহাতপা পুণ্যাত্মার পূতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, তুমি কত পতি-অনুমৃতা সতীর যৌবনোন্মেষব্রীড়া-মন্থরা উচ্ছ্বলিত-লাবণ্য-হিল্লোল-চঞ্চলা অসূর্য্যম্পশ্যরূপলহরীকে আপন অঙ্গে লুক্কায়িত রাখিয়াছ, কত ভয়ঙ্কর অত্যাচারী মহা নিষ্ঠুর যম-ভীত বিশাল বপু বক্ষে লইয়া বিশ্বরাজে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছ, কত কাম-কলা-নিপুণা-রসরঙ্গিনী-কুটিলকটাক্ষা অসতীর লম্পটপ্রিয় অপবিত্র তনুর মহাভার হ্রাস করিয়াছ, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তোমাকে দেখিলেই বিরাট সাত্বিক ভাবের উদয় হয়—চিত্তের আবিলতা টুটিয়া যায়। মান, অভিমান, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ভুলিতে হয়। এমন চিত্ত-সংযমের স্থান আর কোথায়? যোগী সারাজীবন যোগে উপবিষ্ট থাকিয়া যে চিত্তসংযম করিতে না পারেন, সাধক নিভৃত গুহায় অবস্থান করিয়া যাহার চঞ্চলতা নিবারণে অসমর্থ হয়েন, ঈশ্বরানুরাগী জ্ঞানী নানাশাস্ত্রাধ্যয়নে যাহা খুঁজিয়া পান না, তাহা তোমার নিকট আসিলেই পাওয়া যায়।

তুমি কি সমাধির স্থান? বলিতে ভুলিয়াছিলাম, তুমিই সমাধিস্থান বটে। তুমি যে তান্ত্রিক ভক্তের মহাসাধনার প্রমোদক্ষেত্র। তান্ত্রিক সাধক তোমারই বক্ষে আসন পাতিয়া, তোমারই বক্ষে সাধন-সমাধি-যোগে মহামহিমময়ী আনন্দময়ী মাকে লাভ করিয়া থাকেন। আরও বলিতে ভুল হইতেছে, সাধারণ সাধক বা যোগীর কথা কেন, যোগীর যোগী মহাযোগী, —দেবের দেব মহাদেব—যিনি ভাবঘোরে উন্মত্ত হইয়া ভব-ভাব্য মহাধনকে লাভ করিবার জন্য চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্থান পর্য্যটন করিয়া কোথায়ও নির্ব্বিকার সমাধিক্ষেত্র দর্শন করিতে পাইলেন না, নীরব—নির্জ্জন —ভাবোদ্বোধক ভাব-ভূমি দেখিলেন না, আকুল হইলেন —উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইলেন, হে শ্মশান! তিনি তোমাকেই আশ্রয় করিয়া মহাযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার চারু মনোহর, শোভার অন্ত বৈজয়ন্ত ধাম সদৃশ হেমময় সাধের কৈলাস-ভবন তুচ্ছ হইয়াছিল। শ্যামল শাদ্বলময় নিবিড় অরণ্যানী তাঁহার ত্রিনয়নে ভাল লাগিয়াছিল না।— ছুটিয়াছিলেন,—তোমার পবিত্র বক্ষে আশ্রয় লাভের জন্য বিশ্বের সকল স্থান ফেলিয়া তোমার পূতক্ষেত্রে আগ্রহে ছুটিয়াছিলেন। হে শ্মশান! তুমি তাঁহারও চক্ষে পরম পবিত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিলে। সুতরাং তুমি আপ্তচক্ষে, শাস্ত্রচক্ষে পরম পবিত্র। পূর্ব্বকালে রাজন্যবর্গ কোনও মহাপাপীর প্রাণদণ্ডের বিধান করিলে, তোমার বক্ষে তাহার

বধক্রিয়া সম্পন্ন হইত। তাহার কারণ কি বুঝিতে হইলে, ইহাই যেন স্বতঃই উপলব্ধি হয়, অপরাধীকে পবিত্র করিবার জন্যই ঋষিকল্প রাজন্যবর্গের এই ব্যবস্থা ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, মহাপাপী দস্যুগণও তোমাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া তোমারই বক্ষে মহাকালীর অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাহারা দস্যুবৃত্তিতে নিয়োজিত হইত। মহামায়াভক্ত বালক শ্রীমন্ত তোমারই বক্ষে বসিয়া মহাদেবী চণ্ডীকে লাভ করিয়াছিলেন। তোমারই বক্ষে উগ্রতপা বিশ্বামিত্রতাড়িত পরম দানশীল সত্যপ্রিয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের স্থান হইয়াছিল, সেইখানেই তাঁহার মৃত পুত্র পুনর্জ্জীবিত হয়েন এবং তাঁহার সকল পরীক্ষার শেষ হয়। হে শ্মশান! তোমার বক্ষে যে কত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, কত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, কত রহস্যময়ী কাহিনী লুপ্ত রহিয়াছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। তোমাতেই যেন নিত্যশান্তি বিরাজমানা—তুমিই এই জ্বালাময় অশান্তিকর বিশ্ব-মরুভূমির হিমগিরি নিঃসৃত শান্তিময় নির্ঝর বারি। তোমাকে দেখিলে হৃদয়ে এক মহানন্দের তরঙ্গ ছুটিতে থাকে।

শ্মশান! তুমি অতীত ও অনাগতের সন্ধিস্থল। আবার তুমিই অতীতের চিতাভস্ম লইয়া ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিতেছ। হায় শ্মশান! তোমার এই পবিত্রক্ষেত্রে—তোমারই এই সাম্যময় মহাতীর্থে কত যে স্ফুট ও অস্ফুট প্রতিভা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তাহারা যে

প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিল, সে প্রতিভা গৌতম, কণাদ, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির প্রতিভা অপেক্ষা হীন নহে। তাঁহারা যে মহাপ্রাণতা লইয়া জন্মিয়াছিলেন, হয়ত সে মহাপ্রাণতা বুদ্ধ, খৃষ্ট, লুথার, নাইটিঙ্গেল প্রভৃতির মহাপ্রাণতা অপেক্ষা অনুমাত্র সঙ্কীর্ণ নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত এমন ভগবদ্ভক্তির বীজ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যে, তাহা সম্যক্ বিকশিত হইবার সময় পাইলে নারদ, শাণ্ডিল্য, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, প্রভৃতির ভগবদ্‌ভক্তির সমকক্ষ হইতে পারিত। এমন কত শিশু কত কিশোর তোমার এইখানে আসিয়া সমস্ত সমাজ, সমস্ত জাতি, সমস্ত পৃথিবীকে দৈন্যগ্রস্ত করিয়াছে, কে তাহা বলিতে পারে? বল বল অতীতের সাক্ষী শ্মশান! তাহাদের সেই অস্ফুট প্রতিভা, সেই শান্তিপ্রদ মহাপ্রাণতা, সেই অপ্রকাশিত ভগবদ্‌ভক্তির অপরিসীম ক্ষমতা কি কালের ফুৎকারে একেবারে নিভিয়া গিয়াছে? হে শ্মশান! খল খল হাসিয়া উঠিলে কেন? তোমার ঐ অট্ট হাসিতে আমার বুক যে কাঁপিয়া উঠিল। হে বিস্মৃতির পুরোদ্বারের দৌবারিক! আমি তোমাকে কর যোড়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে একবার বলিয়া দাও, তুমি যাহাদিগকে বিস্মৃতির তমোময় মন্দিরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে, তাহারা কি চিরকালের মত বিশ্ব হইতে বিদায় গ্রহণ করিল? তোমার উৎকট অট্টহাস আমার ভাল লাগে না! ও হাসিতে

আমার প্রাণ কাঁপে! আমি কেবল আকুল প্রাণে—ব্যাকুল ভাবে তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর দাও। অহো! তুমি নরকঙ্কালের দন্তপাঁতি বিকশিত করিয়া আমাকে উপহাস করিতেছ, আর চিতাধূমের অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঐ কলনাদিনী তরঙ্গিণীর কূল দেখাইয়া দিতেছ।

বুঝিয়াছি, পিতৃকানন! তোমার ইঙ্গিত আমি বুঝিয়াছি! তুমি অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাকে বলিয়া দিলে "দেখ নদী কখনও দুকূল ভাঙ্গেনা। উহা যেমন এক কূল ভাঙ্গে, আর এক কূল গড়িয়া তুলে, তেমনি অতীতের কূল ভাঙ্গিয়া ভবিষ্যতের কূল গঠিত হইতেছে, যাহারা জন্মের শোধ এই চক্ষুর অন্তরালে আত্ম গোপন করিয়াছে,—ভবিষ্যতে তাহারা আবার আসিবে, আবার আসিয়া তাহারা সেই প্রতিভা, সেই মহাপ্রাণতা, সেই ভগবদ্ভক্তি সম্যকরূপে ফুটাইয়া তুলিবার অবকাশ পাইবে। তাঁহাদের যে সমস্ত কামনা—যে সমস্ত বাসনা অতৃপ্ত রহিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহা পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইবে। যাহা গিয়াছে—তাহা আবার আসিবে, যাহা একবার সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আর সৃষ্টি ছাড়া হয় না।

হে শতানক! তোমার আশ্বাসে আমি আশ্বস্ত হইলাম। আমি যাহা হারাইয়াছি, আবার তাহা ফিরিয়া পাইব? যেমন গিয়াছে তেমনই পাইব? অহো! এই কথা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, পুলকে প্রাণ নাচিয়া উঠে। আমার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী যে কামনা—যে বাসনা লইয়া তোমারই বক্ষে

পুড়িয়া ভস্মীভূতা হইয়াছে, তাহার সে কামনা—সে বাসনা আবার ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে। তবে তাহার স্মৃতিতে আমি অমন করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছি কেন? উঃ, এই জ্বালা যে শত বৃশ্চিক দংশন জ্বালাকে হারাইয়া দেয়। এই মর্ম্মান্তিক অন্তর্দ্দাহে আমি যে দশদিক্ শূন্য দেখিতেছি।

হে মুক্তিক্ষেত্র শ্মশান! তোমার নিঘৃণ-বক্ষে এই অধমকে একটুকু স্থান দিবে না কি? আমি সংসারে জ্বলিয়া পুড়িয়া ক্ষার হইয়াছি। ত্রিসংসারে আমার আমি ব্যতীত আর আমার বলিতে কেহ নাই। তুমি ত তোমার পবিত্র অন্তঃকরণে সংসারকে আমার করিতে, অভয় দিতে জান; তোমার নিকটে আসিলাম। বড়ই আশা—বড়ই ভরসা, তোমার নিকট কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিব। স্থান দাও, শ্মশান, আমি তোমারই এককোণে বসিয়া সাধনা করিব। এতদিন ইহজীবনে যাহা করিয়াছি, তাহার ধ্বংসের জন্যই তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। ধ্বংসের লীলাভূমি সৃষ্টির লীলাভূমিতে তুমি, সকলই করিতে পারিবে। তুমি হয় ত বলিবে, "আমার নিকটে থাকিতে পারিবে না, আমার তাণ্ডব-নৃত্যে তুমি হত-চেতন হইয়া পড়িবে। সংযমী সাধক না হইলে, কেহ আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না।" তাহা জানি শ্মশান, তাহাতে আমি ভয় পাইব না, পরীক্ষা করিয়া দেখ। আমার ইহজীবনের বসন্ত ফুরাইয়াছে, আছে সেই রম্যরাজ্য-বিহারী কোকিলের বিরহসঙ্গীত। অনুরাগের মুকুল

শুকাইয়াছে আছে মাত্র—দুঃখময়ী, জ্বালাময়ী, স্বপ্নময়ী স্মৃতি। ফুল ঝরিয়া গিয়াছে, আছে মাত্র—শোভাহীন তরু। আর এজীবনের সুখ কি? তাই তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি মানবকে বেশ জাগ্রত রাখিতে পার। যে, আসক্তির মহারজ্জুতে আবদ্ধ, সেও তোমার নিকটে আসিলে, ক্ষণেকের জন্য তাহারও বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। পুত্র-স্নেহাকুলা জননীও তোমার বক্ষে মৃতপুত্র আনিয়া তোমায় দেখিয়া ভুলে। সতীরও পতির মুখ মনে পড়ে না।

ওহো হো! একি ধ্বনি শুনা যাইতেছে। ধীর পবনে ধীরে ধীরে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেন কোন্ অনন্তে গিয়া মিশিয়া যাইতেছে। হাহাকারের উদাসিনী মূর্ত্তি যেন উলঙ্গিনী হইয়া দিগ্‌দিগন্তে নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে। শোকের সুর চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিল। তাহার মধ্য হইতে ধ্বনি উঠিল—"বল হরি, হরিবোল।" শরীর শিহরিল, প্রাণ চমকিল, কে যেন মর্ম্মের তন্ত্রী টানিয়া ছিঁড়িয়া লইল, ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। হরি! হরি!! এমন মধুর হরিবোলে এমন আতঙ্ক আসিল কোথা হইতে? যে হরি-নামে প্রাণ মাতোয়ারা হয়, জীবন শীতল হয়, পুলকে হৃদয় নাচিয়া উঠে, আজ কেন এই শ্মশানে আসিয়া সেই নামে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল?

কম্পিত প্রাণে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ধ্বনি নিকট হইতে নিকটে আসিতে লাগিল। দেখা গেল

শ্মশান দৃশ্য

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা

কয়েকজন শববাহী শব স্কন্ধে লইয়া ঐ বিষাদভরা হরিনামের ধ্বনি করিতে করিতে শ্মশানাভিমুখেই আসিতেছে। পশ্চাদ্ভাগে জনৈকা বৃদ্ধা কাঁদিতেছিলেন, বুঝিতে বাকি রহিল না। শববাহীরা আসিয়া যথাস্থানে শব রক্ষা করিল। বৃদ্ধা বাতাহতা কদলীর ন্যায় সেই শবোপরি পতিতা হইলেন। হায়! এখনও সেই লোমহর্ষণময় চিত্রখানি আমার হৃদয়ের পরতে পরতে উৎকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এখনও যেন সেই ভাঙা ভাঙা ক্রন্দনের স্বর আমার শ্রবণবিবরে যাতায়াত করিতেছে। অশ্রু আসিল। সহসা দিনমণি যেন মেঘাবৃত হইল। আমি আঁধারে ডুবিলাম, আমার "আমিত্ব" ভুলিয়া যাইলাম। আমি এরূপ করুণ রসাত্মক দৃশ্য আর কখনও এজীবনে দর্শন করি নাই।

কাষ্ঠবাহকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। চিতা প্রস্তুত হইল। একজন আবৃত শব উন্মুক্ত করিয়া দিল। শবদেহ চিতায় ন্যস্ত করা হইল। অগ্নি প্রদত্ত হইল। সর্ব্বভুক্ বৈশ্বানর ধীরে ধীরে মুখব্যাদান করিতে করিতে সমগ্র চিতা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার লেলিহান নীলাভ দীপ্ত শিখা, শ্মশান পার্শ্বস্থ অশ্বত্থ তরুকে আরও সন্তপ্ত করিয়া তুলিল। চট্ চট্ শব্দ হইতে লাগিল। ভীষণ অগ্নিতেজে শবচর্ম্ম ফাটিতেছিল। হুহু ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া শবদেহ জ্বলিতে লাগিল। ভাবিলাম—হায় রে নরদেহের এই পরিণাম! এই শোভাময় বপুর এই পরিণাম! এই মদন-

বিনিন্দিত রূপলাবণ্যের এই পরিণাম! এই ধনৈশ্বর্য্য মানাভিমানের এই পরিণাম!

বৃদ্ধার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি চিতায় পতনোন্মুখ হইলেন। কয়েকজনে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার আকাশভেদী ক্রন্দন-চীৎকারে গ্রামের লোক বাহির হইয়া আসিল। পশু পক্ষীরাও যেন নীরবে শোকাশ্রু ফেলিতে লাগিল। জনতার বৃদ্ধি হইল। আমি তখন সেই স্থান অশান্তিময় ভাবিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। ভাবিলাম—এ শ্মশানেও আমার সুখশান্তি নাই। ভাবিলাম—এই কি আমার বৈরাগ্য? শ্মশান-বৈরাগ্য শ্মশানেই বিলীন হইল, গৃহে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল না। বড়ই ক্ষোভ আসিল। আবার আমি, আমার "আমি" সঙ্গে লইয়া ছুটিলাম। দূর হইতে দেখিলাম—কাতারে কাতারে জনসঙ্ঘ দণ্ডায়মান। নির্নিমেষলোচনে চিতাগ্নি দেখিতেছে। তখনও চিতা জ্বলিতেছে "ধূ ধূ ধূ।"

শ্মশান সম্বন্ধে কত কথা আমার মনে উথলিয়া উঠিল, কত গ্রন্থের কথা, কত লোকের কত কি সিদ্ধান্ত, ক্রমে ক্রমে আমার মনে উদিত হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ জনৈক ইংরাজ লেখকের শ্মশান চিন্তার কথা আমার মনে পড়িল। এই চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন— "Grave is a great leveller" অর্থাৎ সমাধিক্ষেত্র সকলকেই সমান করে। এদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ লেখকও ইহারই

প্রতিধ্বনি করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইংরাজের পক্ষে এ কথা সত্য বলিয়া অনুভবের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু শ্মশানকে সেরূপ মনে করেন না। শ্মশানে আসিলেই সকলে সমান হয় না। রাজার শববাহি পালঙ্ক বহুমূল্য বস্ত্রাস্তরণে আচ্ছাদিত, কুসুমদামে পরিশোভিত; আবার অপর পক্ষে নগণ্য ব্যক্তি ছিন্ন চটে, দড়ির খাটে শ্মশান-শয্যায় দীনতার সাক্ষ্যই বহন করে। হাস্পাতালের গাদার মৃতদেহ দড়ীর খাটুলিতেও বঞ্চিত। শ্মশানক্ষেত্রের ধূলি ভস্মেই তাহার দেহ বিলুণ্ঠিত হইয়া অবশেষে ভস্মীভূত হয়। তবে কেমন করিয়া বলিব, 'এখানে ধনী দরিদ্র সকলেই সমান'?

কাহারও দেহ ঘৃতসিক্ত চন্দন কাষ্ঠের সহিত দগ্ধ হয়, কাহারও ভাগ্যে বনের কাষ্ঠও জুটিয়া উঠে না; অদগ্ধ অবস্থাতেই কাহারও মৃতদেহ গৃধিনী শৃগালাদির উদরস্থ হয়; তবে কেমন করিয়া বলিব, 'এখানে ধনী দরিদ্র সকলেই সমান'?

কাহারও দেহ রোদনের তীব্ররোলে—হাহুতাশের প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে,—বক্ষে করাঘাতের চটপট শব্দে শ্মশানে ভস্মীভূত হয়; কাহারও দেহ জগন্মঙ্গল নামসংকীর্ত্তনের পবিত্র ধ্বনিতে পবিত্র যজ্ঞের শেষ আহুতির ন্যায় শ্মশানের অনলে মিশিয়া যায়; আবার কাহারো দেহ নীরবে, নিঃস্নেহে, নিষ্প্রাণ কাষ্ঠ খড়ের ন্যায় শ্মশানের অনলে দগ্ধ হয়; তবে কেমন করিয়া বলিব, 'এখানে ধনী দরিদ্র সকলেই সমান'?

তুমি বলিবে, আমি ভস্মীভূত হওয়ার কথাই বলিতেছি, শ্মশানের অনলে, সকলেই সমভাবে ভস্মে পরিণত হয়। এখানে ধনীর দেহ, দরিদ্রের দেহ—পণ্ডিতের দেহ ও মূর্খের দেহ—সুন্দরের দেহ ও কুৎসিতের দেহ সকলেরই সমানাবস্থা—সমান গতি,—সমান রূপ—কেবলই ভস্ম"।

স্থূল দৃষ্টিতে তাই বটে। কিন্তু ভস্মেরও পার্থক্য আছে। স্বর্ণ পুড়িয়া ভস্ম হয়, রৌপ্য পুড়িয়া ভস্ম হয়, প্রবাল পুড়িয়া ভস্ম হয়, তাম্র পুড়িয়া ভস্ম হয়, লৌহ পুড়িয়া ভস্ম হয়, খড় পুড়িলেও ভস্ম হয়। ভস্ম সকলই—কিন্তু সকল ভস্মই কি সমান? সকল ভস্মেরই কি সমান দর? শাক্যসিংহের দেহ-ভস্ম রত্নমূল্যে রেণু রেণু করিয়া লোকে সংগ্রহ করিল, স্তূপে স্তূপে তাহা সযত্নে সংরক্ষিত হইল, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ স্থানে সেই সংরক্ষিত ভস্মকণার পূজা করিল,—আজও সে পূজার বিরাম নাই। আবার কত শ্মশান ভস্ম, শৃগাল কুকুর গৃধিনীর মলমূত্রের সংমিশ্রণে অমেধ্য পদার্থে পরিণত হয়! তাই বলি শ্মশানের সকল ভস্মই কি সমান হয়?

দেহ যখন দগ্ধ হয়, সকল দেহই কি সমভাবে জ্বলে? কাহারও দেহ দেখিতে দেখিতে সুগন্ধি কর্পূরের ন্যায় শ্মশানের আগুনে মুহূর্ত্তমাত্র সময়ে জ্বলিয়া যায়, আবার কাহারও দেহ স্বীয় পূতিজলে প্রজ্জ্বলিত বৈশ্বানরকে শত বার নির্ব্বাপিত করিয়া দাহকগণের মহাবিরক্তিতে অবশেষে ধীরে ধীরে ভস্মে পরিণত হয়। তাই বলি সকল দেহের জ্বলন, প্রক্রিয়াই

কি সমান ? যে কর্ম্মফল দেহের আরম্ভক, হরি হরি !—অন্তিমে শ্মশানের অনলেও দেহে সেই কর্ম্মফলেরই বিচিত্র লীলা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; তবে কেমন করিয়া বলিব, 'এখানে আসিলে সকলেই সমান' ?

যিনি ঋগ্‌বেদের প্রধান দেবতা, যিনি সুকৃতি দুষ্কৃতির সাক্ষী, যাঁহার মুখে দেবতাগণের আহার, সেই জাতবেদা বৈশ্বানরের সমক্ষে পুণ্যবান্ ও পাপী, পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেই কি সমান ? তুমি বলিবে "শ্মশানের অনলে নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক সকল বৈষম্যকেই সমান করে ?" পূর্ব্বেই বলিয়াছি তো স্বর্ণভস্ম ও খড়ভস্মের কি সমান দর ? স্বর্ণে ও খড়ে যে নৈসর্গিক বৈষম্য দৃষ্ট হয়, শ্মশানে তাহার সমতা হয় কি ? পাপীর পাপ ও পুণ্যবানের পুণ্য এই অনৈসর্গিক ভেদ শ্মশানের অনল বিধ্বস্ত করিতে পারে কি ? মৃত্যুতেই সকল প্রকার ভেদ মোহ নিরাকৃত হয় কি ? যদি শ্মশানে আসিলেই সকল জ্বালা ফুরাইত, সকল দুঃখের অবসান হইত, সকল বৈষম্য তিরোহিত হইত, তবে আর পাপের ভয় কি ? পুণ্যেরই বা পুরস্কার কি ? পরলোকের জন্যই বা এত কথা কি ? এত শাস্ত্রানুশাসনেরই বা প্রয়োজন কি ? যদি শ্মশানে উপস্থিত হইলেই সকল জ্বালার নিষ্কৃতি হইত, তবে কেই বা সম্পদের ছলনা, বিপদের তাড়না, রোগের বেদনা, লোকের গঞ্জনা ও যমের যাতনা, এমন নিঃসহায়ের মত সহ্য করিত। এক-গাছি রজ্জুতে, একবিন্দু গরলে, অথবা একটী কণ্টকের সাহায্যে

অতি সহজেই তথাকথিত শান্তিপ্রদ শ্মশানভূমিতে আমরা আমাদের দেহকে উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হইতাম।*

কিন্তু এখানেই কি মর্ম্ম দুঃখের অবসান? এখানেই কি জীবনের সকল কষ্টের অবসান? শ্মশানের অনল সকলই পুড়িতে পারে, কিন্তু পুড়িতে পারে না, কেবল আমাদের কৃতকর্ম্ম। দেহ কিছুই নয়, দেহের ভস্মতা বা অভস্মতার সহিত জীবের কোনও সম্বন্ধ নাই। জীবই ভোগী, জীবই কর্ম্মফল লইয়া বর্ত্তমান দেহত্যাগ করে। সুতরাং দেহ-ত্যাগে জীবের কোন বৈষম্য তিরোহিত হয় না। যাহারা দেহাত্মবাদী, তাহারা মনে করে দেহধ্বংসেই বুঝি আমাদের ভালমন্দ, পাপপুণ্য, আশা-নৈরাশ্য, সুখ দুঃখ সকলই তিরোহিত হয়। ইহা অধ্যাত্মবাদের কথা নহে। যাঁহারা

---

* For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor's wrong, the proudman's contumely,
The pangs of despised love, the law's delay,
The insolence of office, and the spurns,
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make,
With a bare bodkin ? who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life;
But that the dread of some thing after death,—
The undiscovered country, from whose bourn,
No traveller returns,—puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have,
Than fly to others that we know not of!

Act III, Scene 1.
Hamlet, Shakespeare.

স্থূলদর্শী তাঁহারা জানেন জীব-চৈতন্যের সহিত শ্মশানের অনলের কোন সম্বন্ধ নাই—শ্মশানে তাহার কোনও বৈষম্য দূরীকৃত হয় না। মৃত্যু কোন ভেদ তিরোহিত করিতে পারে না। সুতরাং মৃত্যু সাম্য সংস্থাপক বা Leveller নয়। কর্ম্মশক্তির অনন্ত বৈচিত্রীর মধ্য দিয়া জীবকে জন্মে জন্মে আপন গম্য পথ খুঁজিয়া লইতে হয়। ইহাই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত,—দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ইহা ঋষিবাক্যের অকাট্য সাক্ষ্য। তবে কেমন করিয়া বলিব "এ বাজারে সব একদর" ?

শ্মশান ধর্ম্মভাবপূর্ণ হইতে পারে যেহেতু শ্মশানে আসিলে দম্ভের মস্তক অবনত হয়, গর্ব্বের ধমনী বিষাদে ডুবিয়া পড়ে, কামনা কূর্ম্মশুণ্ডের ন্যায় অন্তর্ম্মুখী হইয়া যায়, ক্রোধ, মেষের ন্যায় শান্তশীলতায় পরিণত হয়, লোভ মোহ মদমাৎসর্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মবৈরীগণ শ্মশানে দেহের পরিণাম-দর্শনে ভীত-ভীত ভাবে সঙ্কোচিত হইয়া পড়ে। সুতরাং একথা অবশ্যই বলিতে হয় যে শ্মশান ধর্ম্মভাব পূর্ণ।

কিন্তু শ্মশান যদি পাপী ও পুণ্যবানের সদ্গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিত, শ্মশান যদি অত্যাচারী ও শান্তিশীলের সমান দর স্থাপন করিয়া দিত, তাহা হইলে কেহই শ্মশানকে ধর্ম্ম-ভাবপূর্ণ স্থান বলিয়া মনে করিতেন না। যেখানে চ্যুত চম্পক ও শাকোটকের সমান দর, হংস-ময়ূর-কোকিল-কুলের সহিত যেখানে কাকের সমতা, কর্পূর কার্পাসের যেখানে

সমান আদর, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও মিথ্যুক চোর ও সাধুর যেখানে কোন পার্থক্য বিচার হয় না, গুণিজন সে দেশের আদর করেন না। তাহা হইলে শাস্ত্রের বাক্যও অনর্থক হইয়া পড়ে। ফলতঃ এই ঔদার্য্য ধর্ম্মনীতির বিঘাতক বলিয়াই পরম-কারুণিক শাস্ত্র, পাপপুণ্যের বিচার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যদি বল শ্মশান সকলকেই আপন অঙ্কে স্থান দেয়, এই জন্যই শ্মশানের এই মাহাত্ম্য। তাহা হইলে আকাশ, বায়ু, অনল, অনিল পথ ঘাট মাঠ প্রভৃতি অবাধ সর্ব্বগম্য স্থানেরই এইরূপ মাহাত্ম্য স্বীকার্য্য হইতে পারে; কেবল শ্মশানের তজ্জন্য এত বিশিষ্টতা কেন?

ফলতঃ শ্মশান জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তির স্থান নয়। উহা কেবল জীবন-নাট্যের এক একটী অঙ্ক-অবসানের রঙ্গ-ভূমি মাত্র। উহাতে নটের কার্য্য শেষ হয় না। শ্মশান-ভূমিতে দেহ বিধ্বস্ত হয় বটে কিন্তু তাহাতে জীবের জীবত্ব নষ্ট হয় না, দেহ ফুরাইলেও তাহার ভোগ ফুরায় না। কত বার আমি তুমি আসিয়াছি, কতবার ঐ শ্মশানের পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছি। শ্মশান আমাদের অপরিচিত নূতন স্থান নহে। শ্মশান আমাদের দুই মুহূর্ত্তের পান্থশালা মাত্র। ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে যেমন আমাদিগকে পেটিকা-পুটলী পান্থশালায় রাখিয়া যাইতে হয়, এইরূপ জীব তাহার প্রাচীন দেহ পেটিকা এই শ্মশানের

পান্থশালায় রাখিয়া দিয়া সূক্ষ্ম-শরীরে গম্যস্থানে চলিয়া যায়।

শ্মশানের ভূমিতে দেহমাত্র মৃত্তিকাসাৎ হয়—জীব কখনও শ্মশানের মৃত্তিকায় মিশিয়া নষ্ট হয় না। যিনি অর্জ্জুন ছিলেন, তিনি হয়ত আবার নেপোলিয়ন হইয়া ভব রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। যিনি ভীম-সেন ছিলেন তিনি হয়ত ক্রনঞ্জির দেহে আবেশ রূপে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু শ্মশানের মৃত্তিকায় ইহারা কেহই লয় প্রাপ্ত হন নাই। মৃত্তিকায় মৃত্তিকাই লয় প্রাপ্ত হয়, পাঞ্চভৌতিক দেহই পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। জীব আবার নুতন করিয়া কর্ম্মভোগে প্রবৃত্ত হয়। তাই বলিয়াছি শ্মশান কেবল পাঞ্চভৌতিক দেহের ক্ষণ-কালের পান্থশালামাত্র।*

* জীবাত্মার অনশ্বরত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

১। ঋগ্‌বেদ—

(ক) প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্বেভির্যত্রা ন পূর্ব্বে পিতরঃ পাবং ১০ম। ১৪পৃ। ৭ঋ

(খ) অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এবং পিতরো লোক মক্রন্। ১০। ১৪। ৯ঋ

এই দুই মন্ত্রার্দ্ধ বৈদিক যুগে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে পঠিত হইত। এই দুই মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে "হে পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিবাসী জীব, তুমি এথা হইতে পিতৃলোকে গমন কর।"

(গ) সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্ম্মণা অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমৌষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরঃ ১০ম। ১৬। ৩

এই মন্ত্রও জীবের দেহনির্য্যাণমূলক। এই মন্ত্রের প্রথম পদের শেষে যে "ধর্ম্মণা" পদটি আছে, উক্ত পদটী কর্ম্মদ্যোতক। অর্থাৎ হে জীব তোমার কর্ম্মানুসারে তুমি স্বর্গে গমন কর বা পৃথিবীতে থাক বা ওষধীরূপে জন্ম গ্রহণ কর।

২। বেদান্ত দর্শন—

তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্।

৩ অধ্যায়, ১ম পাদ, ১ম সূত্র।

আমি ধীরে ধীরে শ্মশান ভূমির সমীপে আবার উপস্থিত হইলাম। তখনও চিতা জ্বলিতেছে। প্রাণে আধার নব উচ্ছ্বাসের প্রবল বেগ বহিয়া চলিল, কণ্ঠ হইতে স্বতঃই কথার স্রোত প্রবাহিত হইল, আমি আত্মহারা হইয়া বলিতে লাগিলাম,—"বম্ বম্ বম্, হর হর হর বাঃ বাঃ বাঃ !! অতি চমৎকার ! এইত যজ্ঞের অনল জ্বলিতেছে—কি পবিত্র, কি মনোরম—কি আনন্দ ! ধক্ ধক্ ধক্—লক্ লক্ লক্—চট্ পট্ চট্—অনল জ্বলিতেছে, শিখা উঠিতেছে ! বীতিহোত্র বৈশ্বানর,—ধন্য তোমার প্রতাপ ! আজ নর-রুধির—নর-মেধই,

ইহার অর্থ এই যে জীব যখন এই স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে গমন করেন, তখন সে দেহ-বীজ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়াই যায়। শ্রুতিতে এই বিষয়ের প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর আছে, সেই প্রশ্নোত্তরের দ্বারা এই উক্ত সিদ্ধান্তই নিরূপিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও লিখিয়াছেন :—

"জীবোমুখ্য প্রাণসচিবঃ সেন্দ্রিয়ঃ সমনস্কোঽবিদ্যাকর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞা পরিগ্রহঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং প্রতিপদ্যতে ইত্যেতদবগতম্।

৩। ন্যায়দর্শন—

পুনরুৎপত্তেঃ প্রেত্যভাবঃ ১।১।১৯।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন :—

উৎপন্নস্য সম্বন্ধস্য সম্বন্ধস্তু দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিবেদনাভিঃ পুনরুৎপত্তিঃ পুনর্দেহাদিভিঃ সম্বন্ধঃ।

৪। Human Personality and its Survival of bodily death.

By F. W. H. Myers.

"We have no right to assume that our physical death is a unique crisis in our history; nor again, if our soul survives that death involves more of change in the soul perceptions than we can plainly infer that it must involve.

We perceive that the material body is destroyed and we may therefore infer that there is no further friction to overcome.

P. 231, Vol. I.

তোমার হোত্রীয় হবি—শ্মশান তোমার স্থণ্ডিল, মহাকাল তোমার হোতা,—অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা আদি ঋত্বিকের অভাব নাই। সপ্তজিহ্ব, আজ নর-শোণিতে ও নরমেধে তোমার,—কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা ধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বসহা, এই সপ্তজিহ্বার তৃপ্তি সাধিত হইতেছে। তাই বুঝি ঠাকুর, তোমার শিখার এমন সমুজ্জ্বল সমুচ্চ প্রজ্জলন! তাই বুঝি এমন লক্ লক্ ধক্ ধক্!! জ্বল, জ্বল আরোও জ্বল; জ্বালাও জ্বালাও, যত পার জ্বালাও। রোগ জ্বালাও, ভোগ জ্বালাও, শোক জ্বালাও, হর্ষ জ্বালাও, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ এবং তৎসম্বন্ধি যত কিছু আছে সব জ্বালাও! কি সুন্দর কি মনোমদ, কি তৃপ্তিপ্রদ,—এই শ্মশান যজ্ঞ!!!

কিন্তু দেবতা, মনে রাখিও, তুমি কৃপীটযোনি। অপ্ তোমার উৎপত্তি স্থান। তোমার জনক জল স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ-মধুর। জনকের গুণ ভুলিওনা। এ জ্বলনের পরিণামে, এ দহনের পরিণামে দেহ-সংঘাত পঞ্চভূতের উত্তেজনা প্রশমিত করিয়া দিও।

হে শ্মশান-যজ্ঞের পবিত্র পাবক, যে পঞ্চভূত, মানুষের কলুষ-কল্মষময় বাসনার সংসর্গে অপবিত্র হইয়া যায়, তুমি তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া দাও, আবার নব সৌন্দর্য্য নব মাধুর্য্যময় নববপুর জন্য উহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ। তোমার এই বৈদিক কার্য্য, বাস্তবিক জগতের পরম হিতকর।

তোমার স্পর্শে সকলেই পবিত্র হয়, অপবিত্রতার মধ্যেতে পবিত্রতার সঞ্চার হয়। যাহা, এ জগতের জল, এ জগতের বায়ু ও এ জগতের ভূমিকে অপবিত্র করে, তুমি সেই পচন-প্রবল মৃত মানব দেহকে আপন যজ্ঞীয় হবিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া জগতের পবিত্রতা রক্ষা কর। এই জন্যই তুমি বেদে "ক্রব্যাদমগ্নিম্" বলিয়া স্তূত ও পূজিত হও।

হে পাবক, হে শ্মশান যজ্ঞেশ্বর, হে হুতাশন জগতে যত যজ্ঞ আছে, তোমার শ্মশান-যজ্ঞের ন্যায় পবিত্র যজ্ঞ আর কোথাও দেখিতে পাই না।

এ জগতে যাহারা জন্মে, তাহাদের প্রাণের খবর তোমার সুবিদিত, তাই তোমার নাম জাতবেদা। শ্মশান যজ্ঞে তোমার নামের প্রকৃত সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। তুমিই জীবিত দেহের জীবনের সাক্ষী, তাই তুমি জাতবেদা। শ্মশান মহাযজ্ঞে তুমি আপন জ্ঞানের পরিচয় দাও, তুমি ধন্য।

বর্হিস্—চিরদিনই ইন্ধনে তোমার আনন্দ। আজ তুমি অতি উত্তম ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছ। হৈয়ঙ্গবীণ ঘৃত অপেক্ষাও নরমেধ তোমার অধিকতর তৃপ্তিকর। নরের অস্থি, সর্ব্ব ইন্ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইন্ধন। তোমার শ্মশান যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার বাস্তবিকই চমৎকার!

শ্মশান কে বলে তোমায় ভীষণ,—কে বলে তোমায় শোকের বিষাদ মন্দির,—কে বলে তোমায় মহাসংহার লীলার নিদারুণ-রুদ্র ভূমি!

আমি দেখিতে পাইতেছি, তুমি সুন্দর, চিরসুন্দর—বিশ্বের-চির মধুময় সুহৃদ্। এই সংসারে যে দেহ অনাদৃত, যে দেহ অপমানিত, অস্পৃশ্য ও ঘৃণিত, তুমি তাহাকেও মধুময় সখার ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া আপন অঙ্কে স্থান দাও! কত শোকাশ্রুসিক্ত বিষণ্ণ মুখমণ্ডল তুমি তোমার শান্তিময় বক্ষে স্থান দান করিয়া চিরদিনের মত তাহাদের বিষাদ ছবি জগৎ হইতে অন্তর্হিত কর।

তুমি মহারুদ্রের সংহার-লীলার রুদ্রভূমি নহ—, তোমাতেই পুরাতন জীর্ণ জীবের বিষয়-বাসনা-বিদূষিত পঞ্চভূত পবিত্র হয়, নূতন প্রাণ জাগিয়া উঠে, জীব নূতন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইবার পথ প্রাপ্ত হয়। জগতে কিছুরই মরণ নাই, কোন পদার্থেরই ধ্বংশ নাই। বিশ্বের আদ্যন্ত মহাসত্ত্বায় পূর্ণ। শূন্য হইতে বিশ্বের ও বিশ্বমানবের উৎপত্তি নহে, শূন্যে ইহার শেষ বিশ্রাম নহে। ইহাই বেদ-বেদান্তের চরম মীমাংসা। ইহাই নব্য বিজ্ঞানের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত।* জগতের কোনও মূল পদার্থের বিনাশ নাই, কেবলই আকার পরিবর্ত্তন।†

* শ্রুতি বলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি—তদেব ব্রহ্ম।"

ভগবদ্গীতা বলেন ঃ—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক হারবার্টস্পেন্সার বলেন ঃ—

† There was universely current a notion that things could vanish nto absolute nothing.........that the matter is indestructible has now become a common place. Matter neither comes into existence nor ceases to exist. The seeming annihilators of matter turn out on observation to be only change of state.—First Principles.

তাই বলিতে ছিলাম—শ্মশান সংহারের ভূমি নহে ; উহা নব জীবনেরই সূতিকাগার,—জাগতিক পদার্থের নব লীলার প্রথম রঙ্গালয়। আমাদের নয়নের অন্তরালে এই শ্মশানে প্রতিনিয়ত যে নব সৃষ্টির অনন্ত লীলা অবিশ্রান্তভাবে প্রকাশ পাইতেছে, সেই নব উদ্যম, নব কার্য্যশক্তি ও নবপ্রাণতা কি সুন্দর, কি মনোরম,—কি বিপুল শিক্ষার চির সত্য সারস্বত মন্দির !

হর, হর, বম্, বম্, জয় বিশ্বনাথ—দয়াময় ! একবার দিব্য দৃষ্টি দাও, তোমার এই শ্মশান ক্ষেত্রের নন্দন কাননের অনন্ত সুগন্ধময় সৌন্দর্য্য দেখিয়া লই—সংযোগে বিয়োগ, আবার বিয়োগেই সৃষ্টি—জীবণে মরণ, আবার মরণেই প্রাণের সুন্দর নিত্য প্রবাহ,—কিছুরই বিনাশ নাই, কেহ মরে না, সকল বস্তুই নিত্য ; শক্তি শাশ্বতী ও সনাতনী ; কেবল রূপেরই পরিবর্ত্তন।*

বাবা মৃত্যুঞ্জয়, তোমার শ্মশান কি মনোহর ! তাই বুঝি তুমি সকল ছাড়িয়া—সকল ভুলিয়া শ্মশান এত ভালবাস ? তাই বুঝি চিতাভস্ম তোমার ঐ রজতশুভ্র বরবপুর উজ্জ্বল আলেপন ! মা মহাকালি শ্মশানেশ্বরি ! এই শ্মশান তোমাদের যুগল লীলার কি মনোরম ক্ষেত্র ! এই শ্মশানের ভস্ম হইতেই

* Vide—Indestructibility of matter, The continuity of motion. The Persistence of force. The transformation and equivalence of forces.

Herbert Spencer's
First Principle.

বুঝি' তোমরা এই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় বিপুল বিশ্বের সৃষ্টি কর!

লোকের কি ভ্রম!—এখানে আবার পোড়ে কি?—এখানে আবার মিশে কি?—এখানে আবার লয় পায় কি?—আমি দেখিতে পাই, এই শ্মশানই বিশ্বের আনন্দময় সূতিকাসদ্ম অভিনব উৎপত্তির কেলি-নিকেতন,—পবিত্রতার পুণ্য পীঠস্থান —মহাযোগীর মহাধ্যানের নিভৃত মন্দির,—প্রাচীন প্রকৃতির নবলীলা নিকুঞ্জ; ইহার কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জরণ,—শাখায় শাখায় বিহগ কূজন,—পুষ্পে পুষ্পে সুগন্ধি মধু! শ্মশান বাস্তবিকই বিশ্বেশ্বরের নন্দন কানন—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের নব বৃন্দাবন। এ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, মহামায়া মহাশক্তির প্রসাদে তাঁহারই কৃপাশীর্ব্বাদে দিব্য দৃষ্টিলাভ ভিন্ন শ্মশানের এই নব শোভা ও নব প্রাণ সন্দর্শন একবারেই অসম্ভব। মহাকালের এ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় কেলি-নিকুঞ্জ অপরের দুষ্প্রেক্ষ্য, দুর্নিরীক্ষ্য ও দুরধিগম্য।

কিন্তু সত্যের বিনাশ নাই, সত্যের অপলাপ করা যায় না। তুমি স্থূল দৃষ্টিতে যাহা দেখ, স্থূল জ্ঞানে যাহা জান, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে অনেক বস্তুই তাহার বিপরীত বলিয়া বুঝিবে। সূর্য্যকে থালার মত দেখিতেছ, পৃথিবী নিশ্চলা; সূর্য্যকেই গতিশীল বলিয়া মনে করিতেছ। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিবে—তোমার এ জ্ঞান প্রকৃত সত্যের বিপরীত। তুমি রজ্জুকে সর্প মনে করিতেছ—ইহা

তোমার বিবর্ত্তজ্ঞানেরই পরিচায়ক—এ ধারণা ভ্রমাত্মক ও অলীক—ইহা অধ্যাস, ইহা বিবর্ত্ত, ইহা মায়া বা বিভ্রান্তি। শ্মশানতত্ত্বে যাহাদের প্রবেশ অধিকার নাই, তাহারাই শ্মশানকে ভীষণ বলিয়া মনে করে, তাহাদের নিকটই শ্মশান নিদারুণ শোকভূমি বা জীবনের সমাধিক্ষেত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী মনীষাসম্পন্ন মহাযোগীদের অন্তর্দৃষ্টির নিকট. শ্মশান প্রাচীন প্রকৃতির নব কার্য্যক্ষেত্র—কার্য্যোদ্যমের পুণ্য পবিত্রতাময় বিপুল কর্ম্মশালা—মহাবিষ্ণুর অনন্তক্রিয়াশীলতার নিত্য ও শাশ্বত মহাক্ষেত্র।

হে রুদ্রক্রীড়! তুমি কেবল বৈরাগ্যের জনক নহ, সংসারীরও শিক্ষাগুরু। তুমি কেবল ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, সকলেরই সংহারক নহ, তুমি সকলেরই স্রষ্টা। তুমি অতীত লইয়া ভবিষ্যতের কোল পূর্ণ কর। হে অতীত অনাগতের সন্ধিক্ষেত্র! তোমাকে নমস্কার।

হর হর বম্ বম্,—জয় বাবা মৃত্যুঞ্জয়,—জয় বিশ্বনাথ, তুমিই না অর্জ্জুনকে দিব্য জ্ঞান দিয়া তোমার মহাকাল মূর্ত্তি দেখাইয়া চকিত, ভীত, বিস্মিত ও বিত্রস্ত করিয়াছিলে—তুমিই না তোমার লোকক্ষয়কর করালদ্রংষ্টাপূর্ণ জ্বালা-মালার-বিভীষণ ভাব দেখাইয়া তাঁহার চিত্ত-ফলকে মহাশ্মশানের নিদারুণ চিত্র প্রতিফলিত করিয়াছিলে? উহা তোমার স্বরূপ নহে—মায়া মাত্র। উহা তোমারই ছলনা। কিন্তু বস্তুতঃ তুমি চির সুন্দর—চির মধুর! আমি তোমার ঐ

ঘোর করাল বদনেও—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দেখিয়া চির-বিমুগ্ধ। তোমার এই মায়া-শ্মশান আমার নয়নে ত্রিদিবের মহা বৈভবপূর্ণ—আমার নয়নে নয়নানন্দ নন্দনকানন—তাই বা কেন—আমি বলি, আনন্দ-বৃন্দাবন। তুমি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর—চির-মধুর। তোমার প্রত্যেক স্থানই সুন্দর ও মধুর!

যে সাধক তোমায় 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' বলিয়া ভজনা করেন, তাঁহার নিকট তোমার কোন ভাব, কোন মূর্ত্তি বা কোন স্থানই অসুন্দর, অসত্য বা অমঙ্গলজনক বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

যাহারা তোমার পুণ্যনিকুঞ্জ শ্মশান-ক্ষেত্রে আসিয়া তোমার বিমলস্নিগ্ধ পদ-নখ-চ্ছটা সন্দর্শন করিতে প্রয়াস না পাইয়া, পৃথিবীর ধূলিকণার জন্য উন্মত্ত প্রলাপে হা হুতাশ করে, তাহারা নিশ্চয়ই তোমার শ্মশান-তত্ত্ব জানে না; তাহারা কল্যাণ-কল্পতরুর নিকটে আসিয়া কাণা কড়ি খুঁজিয়া ব্যাকুল হয়!

কিন্তু, নাথ, আমরা যেন তোমার এই মহাশ্মশানে চির দিনই তোমার সেই আনন্দ-বৃন্দাবনের নব মাধুর্য্য দেখিতে পাই—তোমার নিত্য নব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময় মোহন মূর্ত্তির মধুময়ী প্রতিচ্ছবি শ্মশান ভূমির সকল ব্যাপারেই যেন আমাদের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলে,—শ্মশানেও যেন তোমার মোহন মুরলীর গান,—তোমার সেই প্রাণমাতান জগদাকর্ষী সুমধুর তানের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়ে ভাসিয়া আসিয়া, হে

চির সুন্দর! আমাদিগকে যেন তোমার দিকেই টানিয়া লয়; আমরা যেন এই চিতাভস্ম তোমারই রাতুল চরণের শীতল ধূলি বলিয়া মাথায় লইতে পারি,—ইহাই প্রাণের একান্ত প্রার্থনা।

যমুনা-পুলিনে।

পূর্ণিমার রাত্রি। ক্লান্ত তনু-মন লইয়া ধীরপাদ বিক্ষেপে যাইতেছিলাম, আর দেখিতেছিলাম—তরল-রজত-জ্যোৎস্না-বিধৌত-নিদ্রিত-ধরিত্রী। বাল্যকাল হইতেই আমি চাঁদ বড় ভালবাসি, কে না ভালবাসে? তাই চাঁদের চাঁদিনীতে বিভোর হইয়া উন্মনস্কভাবে নির্ম্মল নীল আকাশের সৌন্দর্য্যের ছটায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। ঐ নিশীথে নীরবতা-সমাগমে পল্লীপথ নিস্তব্ধ। নিশীথবিজ্ঞাপক দুই একটা নিশাবিহারী পাখীর কাকলী শান্তি-রক্ষক প্রহরীর ন্যায় মাঝে মাঝে আপনাদের জাগরণ-বার্ত্তা জগৎকে জ্ঞাপন করিতেছিল। লতা, গুল্ম, তরুশ্রেণী এতক্ষণ যেন মনুষ্যের যাতায়াতে পরস্পর প্রাণের কথা কহিতে না পাইয়া হাঁপাইতেছিল, এখন তাহারাও মুক্তপ্রাণে মনের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নির্ম্মলচন্দ্র-কিরণ-বিধৌত সুন্দর যামিনীতে যেন ভগবান ব্যথিতকে শান্তিপ্রদানের জন্যই স্বর্গের সুধা শিশির বিন্দুতে পরিণত করিয়া মর্ত্ত্যে—সমগ্র ধরণীতে ছিটাইতেছিলেন। তাঁহার অতুল করুণায় ব্যথিত প্রাণী নিরাময় হইয়া উঠিতেছিল। মৃদু মন্দ বাতাস বহিতেছিল। উদ্দেশ্যহীন আমি অন্যমনস্কভাবে প্রকৃতির হাসি দেখিতে দেখিতে

চলিতেছি। চারু-শুভ্র-চন্দ্রিকা-সম্পাতে সমগ্র ধরণী কেমন এক সুন্দর ভাব ধরিয়াছিল—যেন নব বিবাহিতা বালা নব সৌন্দর্য্যে আত্মহারা—যেন সাক্ষাৎ বাসন্তী বনলক্ষ্মী! আমি যেন আনন্দের মহাসাগরে কোথায় ভাসিতেছি!

ক্রমে পল্লীর প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে শ্যাম-তৃণ-ভূষিত-নয়ন-বিনোদন-বিশাল-প্রান্তর। মাঝে মাঝে তমালতরু ঘন বিন্যস্ত। জন মানবের সমাগম নাই। পল্লীতে বরং ক্বচিৎ গ্রাম্য জন্তুর দুই একটী শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম, এখানে তাহাও নাই, যেন শব্দহীন কোন রাজ্যে আসিয়াছি। ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—শন্ শন্ শন্! বায়ুর গতি সেই নীরবতা ভাঙ্গিয়া সেই নবরাজ্যের নব প্রকৃতিকে বিভিন্ন করিয়া তুলিল। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সাম্যনীতি নহে, কেবলই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এই যাহা দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি, চক্ষু না পালটিতে পালটিতে তাহা ভিন্ন রীতির অনুসরণ করিতেছে। প্রকৃতির ইহাই প্রকৃতি বলিয়া সমস্ত জড় হইতে জীবের পরিবর্ত্তন ঘটে।

চলিতেছি—উন্মনস্ক ভাবে চলিতেছি। সেই বায়ুর শন্ শন্ শব্দ ভেদ করিয়া—দুই একটা তমাল তরু, অতিক্রম করিয়া—ধবল সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিতেছি, যাইতে যাইতে এক দূরাগত সঙ্গীত-সুধা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। গানের ভাষা অব্যক্ত, মাত্র—"কুল্ কুল্ কুল্।" এত

গভীর যামিনীতে কে এই জনবিরল প্রান্তরে সা-রি-গা-মা-ময় মহামন্ত্রে সাধা পবিত্র তাল-মান-লয় স্বরে গাহিতেছে—"কুল্ কুল্ কুল্।" কোকিল-কণ্ঠ-নিন্দিত-তরঙ্গ-স্বর-বাসন্তী-সুধাস্রাবী-বিনোদনিস্বন যেন বিশ্বে অমৃতের .ধারা প্রবাহিত করিয়া দিতেছে; সন্তপ্ত নিদ্রিত জীবকে যেন শীতল ও জাগরিত করিয়া তুলিতেছে; যেন কোন বিপুল প্রেমের বন্যা আনিয়া সমস্ত গ্রাম, নগর, দেশ, মহাদেশ প্রভৃতিকে প্লাবিত করিতেছে; যেন মুমূর্ষু জীবনের শুষ্ক হৃদয়ে সঞ্জীবনী রস ঢালিয়া দিতেছে!

ঐ আবার শোনা যায়, মরি মরি কি মধুময়, অমৃতময়, আবেশময়, প্রেমময়, জাগরণময় বিরহের গান—"কুল কুল কুল।"

'কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো—
আকুল করিল মোর প্রাণ'।

মনে হয় এ মধুময় গানের সুরে সুর মিলাইয়া উহার সহিত এক হইয়া যাই। গাও গাও, অপরিচিত নর কি নারী, তুমি থামিও না, তুমি থামিলে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি লোপ পাইবে; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ঝরিয়া পড়িবে; বসন্ত আসিবে না, মলয় বাতাস বহিবে না, কিশলয় মঞ্জুরিত হইবে না, পুষ্পকলি ফুটিবে না, কোকিল গাহিবে না, চৈতন্য জাগিবে না; গাও, গাও,—গাহিয়া যাও, "কুল্ কুল্ কুল্।"

তুমি কে গান করিতেছ গা? তোমার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া

তোমায় নারী বলিয়া মনে হয়। কোমলা অবলার কোমলকণ্ঠ না হইলে এমন বিমল মধু-পরিমল কোথা হইতে আসিবে? তুমি নিশ্চয়ই নারী। তুমি এ গান কোথা হইতে শিখিলে? তোমার এ রমণীয় সঙ্গীতের শিক্ষক কে? কত দিন—কতমাস—কতবৎসর—কতযুগ ধরিয়া তুমি এ প্রেমময় সঙ্গীত অভ্যাস করিয়াছ? এ সাধনা তোমাকে কে শিখাইল? গাও, গাও, আবার গাও,—"কুল্ কুল্ কুল্।" ভাবে বিভোর হইয়া, গান শুনিতে শুনিতে ধীরমন্থর পদবিক্ষেপে চলিলাম, দেখিলাম সম্মুখে এক তটিনী।—সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে যেন রূপার জলে সাঁতার দিতেছে! তাহার কালতরঙ্গ যেন অনন্তকাল হইতে এই ভাবে খেলিতেছিল, তাই সে অনন্য মনে আপনার কাল অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া হেলিতে দুলিতে "কুল্ কুল্ কুল্" গান গায়িতে গায়িতে চলিতেছিল। আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, বসিলাম, সহসা মনে পড়িয়া গেল—

"যমুনা পুলিনে বসি কাঁদে রাধা বিনোদিনী"। সঙ্গীতের এই প্রথম পদ স্মরণ হইবামাত্র প্রাণ আরও আকুল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম—এই কি সেই যমুনা?

"যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী।
ও যার বিশাল তটে, রূপের হাটে, বিকাতো নীলকান্তমণি,।"*

---

* "যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী।
ও যার বিশাল তটে, রূপের হাটে, বিকাতো নীলকান্তমণি ॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হতেও মনোলোভা,

• এই কি সেই যমুনা? এই কি সেই কালবরণা কালিন্দী? ইহারই পুলিনে বসিয়া কি রাজনন্দিনী, শ্যাম-লাবণ্যপিপাসিনী রাধাবিনোদিনী একদিন শ্যামরূপ-অদর্শনে উন্মাদিনী হইয়া কালিন্দীর তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার মনের মানুষ শ্যামের মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া প্রাণের আবেগে কাঁদিয়াছিলেন? তখন কি আমার ন্যায় কোন পিপাসিত যুবক তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া এই সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন? তাহা না হইলে এ সঙ্গীত রচিত হইল কি প্রকারে? শুধু কবিকল্পনায় এ সঙ্গীত রচিত হইতে পারে না। যদি হইত, তাহা হইলে এ সঙ্গীতের ভাব তত মর্ম্মান্ত-ভাবোদ্দীপক হইত না।

সত্যই একদিন শ্রীমতী শ্যাম-ভাবে বিভোরা হইয়া

কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম;—
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু মা যশোদা রোহিণী॥
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ,
ধড়া চূড়া পরা কোথা ননীচোরা;
কোথা সে বসন চুরি, ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী॥
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা সে জলকেলি,
কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী;
কোথা সে বংশীধারী, রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী॥
কোথা সে নূপুর ধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিনী;
মধুর হাসি মধুর বাঁশি নাহি শুনি,
ও যার মোহন স্বরে, উজান ভরে, বইতে তুমি আপনি।
তোমার তটে তটে, তোমারই ঘাটে ঘাটে,
তোমার সন্নিকটে কই সে ধনী,
ও যার মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী।
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ্ মাঝারে পা দুখানি,
পরিব্রাজক বলে চরণ তলে লুটাই শির দিন যামিনী॥

এই খানে আসিয়া অশ্রু ঢালিয়াছিলেন, সত্যই ভাবুক ভক্ত তাহা দেখিয়াছিলেন। সে ভাব তিনিও হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না, তাই তাঁহার ভাব-সাগর হইতে এই সুধার হিল্লোলে, মধুময় সঙ্গীত উত্থিত হইয়াছিল। কালিন্দী ও রাজনন্দিনীর দুঃখে পরবশ হইয়া আকুল হইয়াছিলেন, তাহা না হইলে সেই অতীতের স্মৃতি এত নূতন করিয়া সম্মুখে আসিতেছে কিরূপে? যেন তখনও সেই অতীত সঙ্গীত কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতেছিল!

আহা রে যমুনে! সেই দুঃখের গান গাহিতে গাহিতে বহিতেছ, বহিয়া যাও। কাহারও কথা শুনিও না, কাহারও বাধা মানিও না, কাহারও বিদ্রুপোক্তি শুনিয়া লজ্জিত হইও না, ভয় পাইও না। ধীরে ধীরে বহিয়া যাও। যে গানের তুমি ভিখারিণী, যে রূপের তুমি পাগলিনী, তাঁহার চিন্তা-লহরীকে আপন লহরীতে লইয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাও। সে পুরাতন ভাব জাগাইয়া দাও। আবার যেন ব্রজের কানু তোমার তীরে আসিয়া খেলা করে; দাম, বসুদাম, শ্রীদাম, সুবল আবার যেন "ভাই কানাইরে" বলিয়া তোমার জলে ঝাঁপ দেয়। আবার যেন শ্যাম অভিলাষিণী প্রেমময়ী আহিরিণীগণ মাটীর কলসী তোমার জলে ভাসাইয়া দিয়া শ্যাম দর্শনের অপেক্ষা করে। মা যশোদা, পিতা নন্দ, গোপাল-বিরহে পাগল পাগলিনীর ন্যায় তোমার তটে ছুটিয়া আসিয়া যেন গোপালের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে।

যমুনে! তোমার সেই একদিন, আর আজ এই একদিন! পুণ্যবতি! তুমিও কি জ্বালাময় মর্ত্ত্যে আসিয়া মর্ত্ত্যের জ্বালা ভোগ করিতেছ? কোথায় তোমার সেই আনন্দ? যে দিন আনন্দময় আনন্দে আসিয়া, আনন্দে হাসিয়া তোমার আনন্দময় নির্ম্মল নীল সলিলে অবগাহন করিয়া মহানন্দে খেলা করিতেন, যে দিন গোপীমোহন নন্দনন্দন গোপীগণের সঙ্গে থাকিয়া অতি সঙ্গোপনে তোমার তমাল-তরু-বেষ্টিত প্রমোদ-পুলিনে লুকাইয়া থাকিতেন, আজ কোথায় তোমার সেই আনন্দ! যে দিন গোপীরা কৃষ্ণহারা হইয়া তোমার জল তোল পাড় করিয়া ফেলিতেন বা তোমারই জলে সকলে মিলিয়া জলকেলি করিতেন, যে দিন গোপাল গোপালদিগকে তোমার জল পান করাইয়া স্বয়ং তোমার কুলে দাঁড়াইয়া অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিতেন, আজ কোথায় তোমার সেই আনন্দ!

দেখ যমুনে, মা আমার! সেই একদিন, আর আজ এই একদিন! সে দিন তুমি আনন্দের লীলাময়ী ছিলে, সে দিন তুমি শ্যামসোহাগের সোহাগিনী—আদরিণী ছিলে, শ্যাম তোমার কুলে সর্ব্বদা থাকিতে ভালবাসিতেন বলিয়া কৃষ্ণগতপ্রাণ সমস্ত ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনীগণ সর্ব্বদাই তোমারই কুলে কুলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তবে যমুনে! সেই দিন—যে দিন তোমার একটানা স্রোতের বিপরীত-দিকে কানু আসিয়া বেণু বাজাইতেন, সেদিন তুমি কি করিতে? শ্যামের নিমিত্ত আকুল হইয়া উজান বহিতে না কি?

আজ বেণু আর কে বাজাইতেছে? আজ কে আর আসিয়া তোমাকে সেই ভাবে নাচাইতেছে? সে মহানন্দের মহামুহূর্ত্ত আজ আর কে আনিতেছে? কাহাকে দেখিয়া নাচিবে? কাহাকে দেখিয়া আর খেলিবে? কাহাকে দেখিয়া হাসিবে?, কাহাকে দেখিয়া গাহিবে? আজ কেবলই সেই অতীতের দুঃখের গাথা গাহিয়া বুক ভাসাইয়া ফেলিতেছ, ভাবিতে ভাবিতে এক একবার শিহরিয়া উঠিতেছ, কিন্তু তোমার ন্যায় দুঃখিনীর অবস্থা কে ভাবিতেছে? কাহার প্রাণে আঘাত লাগিতেছে? তাই বলিতেছি সেই একদিন—আর এই একদিন!

তুমি একদিন রাজরাজেশ্বরী রাজরাণী ছিলে, আজ কালের চক্রে ভিখারিণী! মনে পড়ে—ত্রেতায় তোমারই বিশাল তটের অদূরভাগে সমন্তপঞ্চকে পরশুরাম ক্ষত্রিয়শোণিতে পাঁচটী হ্রদ পূর্ণ করিয়া তাহাতে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। পরশুরাম-সমরে তোমার কুলু কুলু নাদের সহিত কত ক্ষত্রিয়ের আর্ত্তনাদ মিশিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? আবার বিমাতার বাক্যবাণ ব্যথিত তপঃসিদ্ধ বালক ধ্রুব যখন তোমারই কূলে কূলে করুণস্বরে কোথায় "পদ্মপলাশ-লোচন হরি" বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিজন বিপিনে বেড়াইয়া-ছিল, তখন সেই সরল সাধকের সুধামাখা ভক্তিগীতের মধুরতান তোমারই কুলু কুলু নাদের সহিত মিশিয়া-ছিল! আবার যখন কুরুরাজ তোমার তটান্তের অদূরে

ভূমি চষিয়া কুরুক্ষেত্রের পতন করিয়াছিলেন তখন, বেদজ্ঞ ঋষিগণের বর্ণস্থান সমীহিতা-ধ্বনি তোমারই জলকল্লোলে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছিল। আবার যখন কৃষ্ণের-সখা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন তোমারই তটের অদূরে খাণ্ডবপ্রস্থ দগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন বুভুক্ষু বৈশ্বানরের পীড়নে দহ্যমান জীবকুলের আর্ত্তনাদ গাণ্ডীবের টঙ্কারের সহিত মিশিয়া তোমারই উচ্ছ্বসিত বারিরাশির ভৈরব গর্জ্জনকেও ডুবাইয়া দিয়াছিল। যমুনে! সে গম্ভীর করুণ-নিঃস্বন এখনও কি তোমার কলনাদের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে?

বল বল যমুনে! কুরুক্ষেত্র মহাসমরে যখন সপ্তরথী সম্মিলিত হইয়া পাণ্ডব নয়নমণি ষোড়শবর্ষীয় অভিমন্যুকে অন্যায় কাপুরুষোচিত সমরে নিহত করিয়াছিল, তখন পাণ্ডব-শিবিরে সুভদ্রা ও উত্তরার যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল, তাহা কি তোমার ধ্বনির সহিত যুগযুগান্তর ধরিয়া মিশিয়া রহিয়াছে? আর যমুনে! সেই মহাসমরের অন্তে যখন কুরুকুলাঙ্গনাগণ বিগলিতবেশা, আলুলায়িতকেশা হইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে আকুলি ব্যাকুলি কাঁদিয়াছিল, সে ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি এখনও কি তোমার অই জলকল্লোলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে? তাই কি তোমার জীবনসঙ্গীত এত বিষাদমাখা? তুমি হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, দিল্লীর উত্থান পতন দেখিয়াছ, তাই কি চিরবিষাদে উন্মাদিনী হইয়া অবিশ্রান্ত কুলুকুলুনাদে কাঁপিতেছ?

যমুনে! তুমি উন্মাদিনী হইয়া কত বিষাদের গান গাহিতেছ; তোমার গানে কত যুগ যুগান্তরের স্মৃতি জাগিয়া উঠে! আবহমানকাল তোমার প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। কত বরবপু তোমার তীরে ভস্মীভূত হইয়াছে, কত চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া তুমি মরণ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে উধাও হইয়া ছুটিতেছ, কে তাহার সংখ্যা করিবে? তাই কি তুমি যুগযুগান্তর ধরিয়া কেবল মৃদু-মধুর-তরল-স্বরে বিষাদের গান গাহিয়া যাইতেছ?

একদিন আকবরশাহ তোমারই তীরে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ভারতে মোগলসাম্রাজ্য স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দিল্লীর সুখৈশ্বর্য্য দুই দিনের জন্য ফুটিয়া উঠিয়া আবার বিস্মৃতির তমসায় আত্মগোপন করিতে বসিয়াছে। তাই কি তুমি তাহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য ক্ষীণ-স্বরে সেই গান গাহিতেছ? তোমার সঙ্গমস্থলে—প্রয়াগে কাম্য-কূপে দেহ ত্যাগ করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ দিল্লীর মস্‌নদে বসিয়া আপনার বিভবের গৌরব-চ্ছটায় দশদিক আলোকিত করিয়াছিল, আবার যাইবার সময় শূন্য হস্ত সকলকে দেখাইতে দেখাইতে চলিয়া গিয়াছিল, যেন নীরব ভাষায় বলিয়া গিয়াছিল "যমুনাপুলিনের বৈভব যমুনা পুলিনে রাখিয়াই আমি চলিলাম। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়া আমি যেমন নিঃসম্বলে গিয়াছিলাম, এবারও বাদশাহরূপে জন্মিয়া আমি ঠিক সেইরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় চলিলাম!"

যমুনে! তোমার বিষাদমাখা গীতে জীবন মরণের এই

সমাধানশূন্য সমস্যাও কি উদ্গীত হইতেছে? একদিন তোমারই তীরে বসিয়া দিল্লীর সম্রাট্ সাজাহান মমতাময়ী মমতাজের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া, মর্ম্মর প্রস্তরের জাগ্রতমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থপতিবিদ্যার অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন; সেই সুন্দর সমাধি-মন্দিরের শীতল ছায়া অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের হৈমকিরণে প্রতিভাত হইয়া প্রতিদিন তোমারই অঙ্কে প্রতিফলিত হইতেছে।

তাই বলিতেছি, যমুনে! সেই একদিন—আর আজ এই একদিন! তাই বলিতেছি—শোক দুঃখের কথা ভাবিও না। চিরদিন কখনও সমান যায় না।" যাও, বহিয়া যাও। যে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আজও তাহা বিস্মৃত হও নাই, যে প্রেমের মধুরিমার গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া তাহার কথা আজও ত্যাগ কর নাই, যে প্রেম-হিল্লোলের প্রীতি এখনও তুমি দিবা রজনী জীবকে বুঝাইতেছ, তাহার উদ্দেশে, সে যেখানে আছে সেখানে চলিয়া যাও। নিশ্চয়ই তুমি সাক্ষাৎ পাইবে। বলবতী ইচ্ছারই জয় অবশ্যম্ভাবী। এত আকুলতায় না হয় কি?

যমুনে! মা আমার! যাও, এ অভাগার কথা লইয়া বহিয়া যাও। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিবে, ভুলিলে কেমন করিয়া? রুগ্ন শয্যায় এক দিন যাহার নিমিত্ত সাধের স্থান ত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরে উদয় হইয়াছিলে, অভয় হস্ত গাত্রে বুলাইয়াছিলে, "ভয় নাই" বলিয়া বরপ্রদান করিয়াছিলে,

তাহাকে ভুলিলে কেমন করিয়া? এ ভোলা কি তোমার ন্যায় পুরুষোত্তমের উচিত? তবে দয়াময় নাম লইয়াছিলে কি জন্য? দয়া যদি করিবেই না, তাহা হইলে এ দয়া দেখাইবার আবশ্যকতা কি ছিল?

"যাও যমুনা, চলিয়া যাও, যাও যমুনা, চলিয়া যাও!" বলিতে বলিতে যমুনার জলে নামিলাম। স্রোতে যেমন আমায় টানিতেছিল। মনে হইতেছিল, যমুনা যখন টানিতেছে, তখন ইহারই সঙ্গে ভাসিয়া যাই। সেই নবীননীরধরনিন্দিত নীলকণ্ঠ-সেবিত-নীলকান্তমণির সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসি। কিন্তু হইল না। একবিন্দু অশ্রু সেই যমুনার কালজলে পড়িয়া গেল।

অশ্রু কহিল, "তোমায় যাইতে হইবে কেন? আমি অগ্রে তোমার নৈবেদ্যরূপে তাঁহার নিকটে যাই, তাহাব পর তুমি যাইয়া সাক্ষাৎ করিও।" অশ্রু যমুনার কালজলের উপর ভাসিতে লাগিল! সে, সেই যমুনারই মত নাচিতে নাচিতে তাহার ক্ষুদ্র তরঙ্গের সহিত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। একদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, সে তখনও আমায় আশ্বাস দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি অনুচ্চৈঃস্বরে যমুনাকে কহিতে লাগিলাম, "যাও যমুনে! দরিদ্র ব্যথিতের প্রাণের নৈবেদ্য লইয়া যাও, দেখিও—যেন তাঁহাকে দিতে ভুলিও না।" যমুনা, "না, না,—ভুল হইবে না" বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল তাহার গমনের বিরাম নাই;

যমুনা যেন আজ শত হস্তিনীর বলে তাঁহার উদ্দেশে যাইতেছে, কিন্তু—তখনও তাহার দুঃখের গান ফুরায় নাই, তখনও সে গাহিতেছে "কুল্-কুল্-কুল্।"

সম্পূর্ণ।